পীর ফকীর ও ক্বর পূজা কেন হারাম?

হাফেয মুহাম্মাদ আইয়ূব

পীর-ফকীর ও ক্ববর পূজা কেন হারাম?

হাফেয মুহাম্মাদ আইয়ূব

প্রকাশক ঃ মুহাম্মাদ হারুন উর রশিদ
পরিবেশক ঃ আল- ইসলাহ্ প্রকাশনী, বংশাল, ঢাকা।
প্রথম প্রকাশ ঃ রামাযান ১৪২১, ডিসেম্বর ২০০০ ইং
দ্বিতীয় প্রকাশঃ জিলক্বদ ১৪২২ হিজরী, ফেব্রুয়ারী ২০০২ ইং,
গ্রন্থস্বত্বঃ লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ
মোঃ ইমরান হোসেন, হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশনী
৩৮ হাজী আব্দুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল, (নর্থ সাউথ রোড)
ঢাকা-১১০০, ☎ ঃ ৭১১৪২৩৮

মুদ্রণেঃ হাবিব প্রেস লিমিটেড
৯, নবরায় লেন, ঢাকা-১১০০

মূল্য ঃ ২০ /= টাকা

بسم الله الرحمن الرحيم

অভিমত

মাদ্‌রাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়ার ভাইস প্রিন্সিপ্যাল, শাইখুল হাদীস শাইখ আহমাদুল্লাহ রাহমানী নাসিরাবাদী সাহেব বলেন

نحمد الله العظيم ونصلى على رسوله الكريم، أما بعد:

যত প্রকার অন্যায়-অপরাধ রয়েছে তার মধ্যে শির্ক হচ্ছে আল্লাহর নিকট সবচেয়ে জঘন্যতম এবং মারাত্মক অপরাধ। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা শির্ক এর অপরাধ ক্ষমা না করার ঘোষণা দিয়েছেন।

বর্তমানে বাংলাদেশে শির্ক ও বিদ'আতের মহড়া চলছে। বিভিন্ন স্থানে ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে উঠছে তথাকথিত খানকা, দরবার শরিফ আর মাযার। প্রকৃত ইসলামী শিক্ষা হতে বঞ্চিত জনগণ ভণ্ড পীর-ফকীরের খপ্পরে পড়ে ঈমান হারাচ্ছে। মাযারে গিয়ে ধ্বংস করছে অমূল্য ঈমান এবং আক্বীদা।

এমতাবস্থায় হাফেয মুহাম্মাদ আইয়ূব এক উদ্দোমী যুবক বিভিন্ন সাময়িকী, পুস্তিকা ইত্যাদি প্রকাশ করার মাধ্যমে মানুষকে শির্ক বিদ'আত, কুসংস্কার আর জাহিলিয়াতের অন্ধকার হতে সঠিক আক্বীদার পথে নিয়ে আসার জন্য অনবরত কাজ করে যাচ্ছেন। তিনি ইতিমধ্যে একাধিক পুস্তিকা লিখেছেন এবং এখনো লিখছেন। আমি তার এ ধরনের পদক্ষেপকে মোবারকবাদ জানাই। বক্ষমান **পীর-ফকীর ও ক্বর পূজা কেন হারাম?** শীর্ষক পুস্তিকাটি পড়েছি। আশাকরি এটি সর্বসাধারণের যথেষ্ট উপকারে আসবে। আমি তার এ পুস্তিকাটি বহুল প্রচার এবং তার উত্তরোত্তর সফলতা কামনা করি।

আহমাদুল্লাহ রাহমানী নাসিরাবাদী

ভাইস প্রিন্সিপাল, মাদ্‌রাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া

৭৮, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২০৫

بسم الله الرحمن الرحيم

সূচনার কথা

বর্তমান বিশ্বে মুসলিমরা আজ যে কষ্ট ও মুসিবতে জর্জরিত তার প্রধান কারণ হলো, তাদের মাঝে প্রকাশ্য শিরক ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। মুসলিমরা যে আজ ফিতনা- ফাসাদ, যুদ্ধ- বিগ্রহ, ভূমিকম্প, ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাসের মত প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন হচ্ছে, তা আল্লাহ তা'আলাই মুসলিমদের উপর গযব হিসাবে নাযিল করছেন- তার কারণ হচ্ছে, তারা তাওহীদ বিমুখ হয়ে জঘন্যতম শিরকী আক্বীদা ও কর্মকাণ্ডে ডুবে রয়েছে। গুটি কয়েক দেশ ছাড়া সকল মুসলিম দেশে ও সর্বত্র মুসলিমদের এ অবস্থা বিরাজ করছে বিশেষ করে পীরপূজা, ফকীর পূজা, ক্বরপূজা ও সৃষ্টি পূজা হচ্ছে তার প্রধানতম। এগুলো সম্পর্কে সর্বসাধারণের ব্যাপক ও সঠিক ধারণা না থাকার দরুণ এসব কর্মকাণ্ড দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। পীরবাদ মোটেই ইসলাম সম্মত নয়। ইসলামের আলোকজ্জ্বল পরিবেশে তার প্রচলন হয়নি। তার উন্মেষই হয়েছে ইসলামের পতন যুগে কেউ কেউ ইল্‌মে তাসাউফের মাধ্যমে জনগণকে দ্বীন-ইসলামের দিকে নিয়ে আসতে চেষ্টা করেছেন; কিন্তু পীরবাদে যে মূল্য দোষ-ত্রুটি ছিল, তার বীজ রয়েই গেছে এবং তা সৃষ্টি করে রেখেছে একটি বিষবৃক্ষ । বর্তমানে তা-ই এক বিরাট বৃক্ষে পরিণত হয়ে জনগণকে চরমভাবে বিভ্রান্ত করছে, বিষাক্ত করছে জনগণের আক্বীদা ও আমলকে।

দ্বীন-ইসলামের মূল সুন্নাতকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে এ বাতিল পীরবাদের মুল্যেৎপাটন আজও অপরিহার্য। ব্যক্তিপূজা উৎখাত করে আল্লাহর একত্ববাদ প্রতিষ্ঠার জন্যই ইসলামের আবির্ভাব হয়েছিল কিন্তু ইসলামের অনুসারী মুসলিমরা আজ সেগুলোকেই সওয়াবের কাজ মনে করে আমল করে যাচ্ছে এর চেয়ে আর দুর্ভাগ্যের কি আছে। আরো আফসোস যে, ইসলামের দাওয়াত দানকারী সংগঠনসমূহ বা প্রচারকগণও এগুলোর বিরুদ্ধে ব্যাপক ও জোরদার আন্দোলন চালাচ্ছে না। তাই ঈমান বিধ্বংসী ও সমাজ বিপর্যয়ের কারণ এই সব শিরকী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে গণসচেতনতা সৃষ্টি ও সমাজ থেকে উচ্ছেদের লক্ষ্যে জোর প্রচেষ্টা চালানোর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভব করে **পীর ফকীর ও ক্বর পূজা কেন হারাম?** নামক পুস্তক লেখার প্রয়াস।

এই বই লিখতে যেয়ে যেসব জ্ঞানীগুণীদের বই থেকে সহায়তা নেয়া হয়েছে এবং যারা বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। পরিশেষে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে আমার মরহুম আব্বা মুহাম্মাদ ইদু মিয়া, দাদা-দাদী, নানা-নানী এবং সকল মু'মিন মুসলিমদের মাগফিরাত কামনা করছি।

বইটিতে কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে আমাদের জানালে কৃতজ্ঞ হবো এবং ইনশা-আল্লা-হ পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে।

বিনীত

মুহাম্মাদ আইয়ূব

সূচী পত্র

প্রথম অধ্যায়

১। শির্ক ও তার ভয়াবহ পরিণাম..... ৫
২। পীর মুরিদীর কথা ৬
৩। পীরদের উৎপত্তি সূফীবাদ থেকে.....৭
৪। সূফীবাদের ধারাবাহিক ইতিহাস ৮
৫। পীর-ফকীরদের শরীয়াত ও মারিফাতের দোহাই ভ্রান্ত ১১
৬। সূফীদের ভ্রান্ত ধারণার নমুনা ১৩
৭। পীরদের সিলসিলা ১৩
৮। আল্লাহর অলী ও শয়তানের অলী ১৪
৯। পীর ফকীরদের পাপ মোচনের দাবী ধৃষ্টতা ছাড়া কিছুই নয় ১৫
১০। পীরদের হিদায়াত করার দাবী চরম ভণ্ডামী ১৬
১১। পীর ফকীরদের অসিলা (মাধ্যম) হবার দাবী ঈমান হরণের ফাঁদ ...১৬
১২। পীর ফকীরদের মুর্খতা ১৮
১৩। পীর ফকীরদের আজব কীর্তি ১৯
১৪। পীর ফকীররা কিভাবে কেরামতি দেখায় ও গায়িব বলে? ২০
১৫। আলৌকিক কিছু দেখে ঈমান নষ্ট করা যাবে না ২৬
১৬। যিকরের নামে ভণ্ডামী ২৬
১৭। যিকরের সঠিক নিয়ম ২৭

দ্বিতীয় অধ্যায়

১৮। ক্বর না মাযার ২৯
১৯। ক্বর পূজার সূচনা ২৯
২০। ক্বর পূজা ও টাকা আদায়ের ফন্দি..... ৩০
২১। নবী-রাসূল ও অলীদেরও মৃত্যু হয় ৩১
২২। মৃত ব্যক্তি কিছু শুনতে বা করতে পারে না ৩২
২৩। যে সব অসিলা (মাধ্যম) খোঁজা নিষেধ ও দীনের মধ্যে তার কোন মূল্য নেই ৩৭
২৪। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে মানত হারাম.....৩৮
২৫। ক্বর পাকা করা যাবে না, ভেঙ্গে ফেলতে হবে ৪০
২৬। খাজা বাবার ডেগ..... ৪১
২৭। তিনটি স্থান ব্যতীত নেকীর উদ্দেশ্য সফর নাজায়িয ৪২
২৮। ক্বর পুঁজার সমর্থনে জাল হাদীস ৪৩
২৯। ক্ববরে বা মৃত ব্যক্তির নামে কুরআন পড়া যাবে না ৪৩
৩০। ওরসের নামে জঘন্য কর্মকাণ্ড ৪৪
৩১। নবী (সঃ)-এর ক্বর পাকা করার কারণ ৪৫
৩২। রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ক্ববরে সবুজ গম্বুজ..... ৪৬
৩৩। আহ্বান ৪৮
৩৪। শির্ক থেকে বেচেঁ থাকার দু'আ ৪৮
৩৫। গ্রন্থ পঞ্জী ৪৮

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রথম অধ্যায়

শির্ক ও তার ভয়াবহ পরিণাম

শির্ক অর্থ শরীক বা অংশী স্থাপন করা। আল্লাহ্'র সত্ত্বা ও গুণাবলীর সাথে কোন সৃষ্ট জীবকে সমকক্ষ মনে করার নামই হচ্ছে শির্ক।

যেসব গুণের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ সে সমস্ত গুণ অন্য কারো মাঝে থাকতে পারে এমন মনে করা, যেমনঃ আহারদাতা, মুক্তিদাতা, আরোগ্যদানকারী, ধন-সম্পদ দানকারী, হায়াত-মওত, লাভ-ক্ষতি, কল্যাণ-অকল্যাণের অধিকারী, বিধানদাতা ইত্যাদি ব্যাপারে অন্য কারো কাছে ধরণা দেয়া বা অন্য কারো দ্বারাও এ সকল কাজ সমাধা হতে পারে মনে কারাই হচ্ছে বড় শির্ক। 'ইবাদতের ব্যাপারে অন্য কারো 'ইবাদত করাও এর অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহ বলেনঃ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ، اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ*

আল্লাহর সাথে কোন শির্ক কর না। নিশ্চয়ই শির্ক হচ্ছে সবচেয়ে বড় জুলুম। (সূরা লুকমানঃ ১২ আয়াত)

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সাবধান করে বলেনঃ

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَالَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَاِنْ فَعَلْتَ فَاِنَّكَ اِذًا مِّنَ الظّٰلِمِيْنَ*

"আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নিকট দু'আ কর না, যারা না পারে তোমাদের উপকার করতে, আর না পারে ক্ষতি করতে। যদি এরূপ কর হবে নিশ্চয়ই তোমরা জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (সূরা ইউনুসঃ ১০৬ আয়াত)। এখানে জালিম বলতে মুশরিকদের বুঝানো হয়েছে।

শির্কের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا بَعِيْدًا*

"নিশ্চয় আল্লাহ শির্কের গুনাহ ক্ষমা করবেন না। এছাড়া যাবতীয় গুনাহ তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দিবেন। তবে যে আল্লাহ্'র সাথে অংশীস্থাপন করলো সে ঘোরতর পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত হলো।" (সূরা নিসা ১১৬ আয়াত)

তাই আমাদেরকে সর্বাবস্থায় শির্ক থেকে বাঁচতে হবে যেসব কর্মকাণ্ড দ্বারা শির্ক প্রকাশ পায় তা জানতে হবে এবং এগুলো থেকে সতর্ক হয়ে চলতে হবে অন্যথায় অনেক আমল করলেও জাহান্নামে যেতে হবে।

পীর মুরিদীর কথা

পীর ফারসী শব্দ যার অর্থ হচ্ছে বৃদ্ধ। আরবী ভাষায় উসতায ও নেতাকে শায়খ বলা হয়। (দ্বীনুল হক ১৮ পৃঃ)। পীর মুরিদী শাস্ত্রে কেউ কেউ এ শায়খ শব্দটাকে পারস্যের অগ্নিপূজকদের পীরের সমার্থবোধক বলে উল্লেখ করেছেন। আবার অনেকে বলেছেনঃ খৃষ্টানদের খ্রিষ্ট বলতে যা বুঝায়, হিন্দুদের ব্রাক্ষণ ঠাকুর বলতে যা বুঝায় এবং বৌদ্ধদের ভিক্ষু বলতে যা বুঝায় পীর বা পুরোহিত বলতে তাই বুঝায়। এই পীর শব্দ কুরআন ও হাদীসে নাই এবং সাহাবা, তাবিঈ, তাবি-তাবিঈদের অথবা ইমামদের যুগে পীর বা পুরোহিত সমার্থবোধক কোন শব্দ বা পদবীর অস্তিত্ব ছিল না। **মুরিদ শব্দ আরবী যার অর্থ হচ্ছেঃ কামনাকারী।** তাই এ অর্থ দ্বারা বুঝা যায় এটাই হলো মূল কথা। পীর-মুরীদীর যে প্রথা 'বর্তমানকালে দেখা যাচ্ছে, এ জিনিস সম্পূর্ণ নতুন ও মনগড়াভাবে আবিস্কার। এ জিনিস রাসূলে করীম (সঃ)-এর যুগে ছিল না, তিনি কখনো পীর-মুরীদী করেননি। তিনি নিজে বর্তমান অর্থে না ছিলেন পীর, আর না ছিলেন সাহাবায়ি কিরাম তাঁর মুরীদ। সাহাবায়ি কিরামও এ পীর-মুরীদী করেননি কখনো। তাঁদের কেউই কারো 'পীর' ছিলেন না এবং কেউ ছিলো না তাঁদের মুরীদ। তাবিঈন ও তাবি-তাবিঈনের যুগেও এ পীর-মুরীদীর কোন নাম চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় না। শুধু তা-ই নয়। কুরআন হাদীস তন্ন তন্ন করে খুঁজেও এ পীর-মুরীদীর কোন দলীল পাওয়া যাবে না। অথচ বর্তমানকালের এক শ্রেণীর লোক এ পীর-মুরীদীকে দীন-ইসলামের অন্যতম ভিত্তিগত জিনিস বলে প্রচারণা চালাচ্ছে।

ভণ্ড পীররা কুরআন ও হাদীসের অর্থ বিকৃত করে নিজেদের স্বার্থে মনগড়া কথা বলে মুরিদদের ক্বলব পরিষ্কার করে, ক্বলবে আল্লাহকে আবিস্কার করে, তাওয়াজ্জুতে পাপিষ্ঠকে নাকি কামেল করে, রসূলের মহব্বত পাইয়ে দিয়ে, আল্লাহর দর্শন করিয়ে করিয়ে দেয়ার মাধ্যম সেজে, আল্লাহর অলি সেজে, মুরিদদের পাপের বোঝা নিজের ঘাড়ে নিয়ে যেসব দাবী করছে আসলে তারা ঈমান বিনষ্টকারী এবং শয়তানের সাগরেদ। মুরিদগণ এই বিশ্বাসে পীর ধরেন যে, পীররা তাদের মুক্তির ব্যবস্থা করবেন, আর পীররাও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সে দাবী করেন। পীররা বলেন যে, পীর না ধরলে জান্নাত পাওয়া দুস্কর হবে। তাই এক শ্রেণীর সরল ও অজ্ঞ মানুষগুলো এই ভয়েই পীরের মুরীদ হচ্ছে।

পীরদের উৎপত্তি সূফীবাদ থেকে

সূফী শব্দটি সাফ (পবিত্রতা) অথবা সূফ (পশম) অথবা সূফফা থেকে উৎপন্ন হয়েছে। তাসাওউফ পন্থীদেরকে সূফী বলা হয়। এরা আধ্যাত্মিকবাদীও বটে। এদের গুরুকে পীর নামে অভিহিত করা হয়। (সূফী তত্ত্বের অন্তরালে- ১পৃঃ)। সূফীবাদ মূলতঃ ইরানী দর্শন, বেদান্ত দর্শন, গ্রীক দর্শন, যরথ্রোষ্ট দর্শন ইত্যাদি থেকে ইসলামে প্রবেশ লাভ করেছে, ঐ দর্শনগুলোর জগাখিঁচুরী রূপ হচ্ছে 'সূফীবাদ'। এ সূফীবাদ কুরআন ও সুন্নাহ থেকে উৎপত্তি লাভ করে নাই। কুরআন ও সুন্নাহর কোথাও এর প্রমাণ নেই। (সূফীতত্ত্বের অন্তরালে-৪৯পৃঃ)। কুরআনের গুরুত্বপূর্ণ একটি আয়াতও এর প্রমাণে পেশ করা সূফীদের সাধ্যাতীত। রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মা'রিফাত যুক্ত প্রজ্ঞাপূর্ণ একটি হাদীসও এর (সূফীবাদের) প্রমাণে উদ্ধৃত পেশ করা যাবে না। রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর কাছে আল্লাহর নিকট থেকে যে অহী/প্রত্যাদেশ এসেছিল, তার একটিকেও গোপন করে আবূ বকর (রাঃ) ও আলী (রাঃ)-কে স্বতন্ত্রভাবে শিক্ষা দেননি। রসূলে মাকবুল (সঃ) যদি কুরআনের ও তার ব্যাখ্যার কোন অংশকে জনগণ থেকে প্রচ্ছন্ন রেখে আলীকে শিক্ষা দিয়ে থাকেন। যা সূফীরা দাবী করে তাহলে আল্লাহর বিধান فما بلغت رسلته 'ফামাবাল্লাগতা রিসালাতা' অর্থঃ তা'হলে তুমি তাঁর রিসালাতের দায়িত্বই পালন করলে না" (সূরা আল-মায়িদা আয়াতঃ ৬৭)।

যে রূপ তাঁর নাম নবুওতের তালিকা থেকে বাদ পড়ে যেত কিন্তু তা হয়নি। যেহেতু তিনি (নবী সঃ) রিসালাতের সামান্য অংশকেও প্রচ্ছন্ন করেননি। জনগণ থেকে লুকিয়ে হযরত আলী (রাঃ)-কে স্বতন্ত্রভাবে গোপনে শিক্ষা দেননি, সেহেতু তাঁর নবুওতের ও রিসালাতের সামান্যতম ক্ষতি হয়নি। আল্লাহ বলেনঃ

يَاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ وَاِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهٗ*

"হে রসূল! তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে তোমার কাছে অহী স্বরূপ যা কিছু অবতীর্ণ করা হয়েছে তার সবগুলোকে হুবহু (জনগণের) কাছে পৌঁছিয়ে দাও। যদি তুমি তার একটিও গোপন কর তাহলে তুমি তাঁর দেয়া রিসালাতের দায়িত্বকেই পৌঁছালে না।" (সূরা আল-মায়িদাঃ ৬৭ আয়াত)

একথা স্বতঃসিদ্ধ যে, নবী মুহাম্মাদ (সঃ) তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্বকে যথাযথভাবে পালন করেছেন। কিন্তু সূফীদের উক্তিঃ 'দ্বিতীয়টি অতি গোপনীয় এবং মনোনীত সাহাবীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এটাই ইলমী সিনা।" এদ্বারা প্রমাণ হচ্ছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বহু জিনিসকে গোপন করে ছিলেন! নাউযুবিল্লাহ্। অথচ তিনি একটি হুকুমকেও গোপন করেনি, করলে তিনি রিসালাতের দায়িত্বই পালন করেননি বলে বুঝাবে। আল্লাহর বাণী এ বিষয়ে সুস্পষ্ট। আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই সত্যবাদী, আর বাতিলপন্থীরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।

সূফীবাদের ধারাবাহিক ইতিহাস

অধ্যাপক আব্দুন্ নূর সালাফী তার সূফী তত্ত্বের অন্তরালে পুস্তক ৫৪–৫৫ পৃঃ উল্লেখ করেন যে, নবী (সঃ)-এর যুগে কোন বাতিলপন্থী সূফীর অস্তিত্ব ছিল না। খৃষ্টীয় অষ্টম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ব্যক্তি বিশেষের নামের সাথে আল সূফী উপনাম দেখতে পাওয়া যায়। কুফার শীয়া আল-জাবের ইবনু হাইয়্যান সূফী উপনামে পরিচিত হন। আল্লামা জাহিজ এর মতে উক্ত সময়ে কুফায় আবির্ভূত একটি মরমীবাদী আধা শীয়া গোষ্ঠীর মধ্যে এর ব্যবহার ছিল। নবী (সঃ)-এর মৃত্যুর ৫০ বছর পর থেকে ২০০ বছর পর্যন্ত সূফী শব্দ কুফার চতুঃ সীমানাতেই সীমাবদ্ধ ছিল। প্রকৃতপক্ষে ইহুদী আব্দুল্লাহ বিন সাবার ইসলাম গ্রহণের ছদ্মাবরণে ধীরে ধীরে মুসলিমদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এবং মুসলিম জনগণকে ইসলাম থেকে দূরে এক অন্ধকারাচ্ছন্ন নবোদ্ভূত মতবাদের দিকে ঠেলে দেয়ার ঘৃণ্য ফলশ্রুতি স্বরূপ সূফীবাদের আবির্ভাব ঘটেছে। এরই ষড়যন্ত্রের ফলে খলীফা ওসমান শাহাদাত বরণ করেন। এরই কারণে শীয়া ও সুন্নীর মতভেদ সৃষ্টি হয়।

সূফীরা বলে বেড়ায় যে, নবী (সঃ) গোপনে আলীকে অনেক কিছু শিখিয়েছেন যা তিনি অন্যকে শিখাননি। এর কারণেই পরবর্তীতে বাতিলপন্থীদের উৎপত্তি হয়। ৩০ পারা জাহেরী (প্রকাশ্য) আর ৬০ পারা বাতিনি (গোপনীয়) কুরআন শরীফ সূফী পীরদের সীনায় সীনায় চলে আসে। উল্লেখিত ষড়যন্ত্রের ফলে নবী (সঃ)-এর মৃত্যুর দু'শ বছর পর থেকে সূফীবাদ অন্যতম তথাকথিত বিশেষ মুসলিম জীবন ব্যবস্থা রূপে তরীকত পন্থীদের কাছে স্বীকৃত হয়ে আসছে। নিজেদের মস্তিষ্ক প্রসূত বানানো উপাসনার আনুষ্ঠানিক আচার-পদ্ধতির আবিষ্কার করে তার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করাই ছিল এঁদের মরমী জীবনের বৈশিষ্ট্য। আল্লাহর নবী মুহাম্মদ (সঃ) দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করেন, "লা রাহবানিয়াতা ফিল ইসলাম।" অর্থৎ ইসলামে কোন বৈরাগ্যবাদ নেই।

আর এসূফীপন্থীরা সূফীবাদের নামে সেটাকে ইসলামে আমদানী করেছে। আল্লাহর নবী (সঃ) আলী (রাঃ)-কে কোন গোপন বিদ্যা শিখাননি, এবং আলী (রাঃ)-এর সাথে হাসান বাসরীর সাক্ষাৎও ঘটেনি। সূফীদের কল্পকাহিনী অনুযায়ী হাসান বাসরী আলী (রাঃ)-এর কাছ থেকে উক্ত গোপন বিদ্যা শিক্ষা করেন। আসলে আলীর (রাঃ)-এর সাথে হাসান বাসরীর আদৌ সাক্ষাৎ হয়নি। তবে বাসরী সূফীদের প্রধান ছিলেন হাসান আল-বাসারী, আর কুফাবাসীদের সূফীতত্ত্বের উস্তাদ ছিলেন রবী বিন খায়সম। ক্রমে ক্রমে ২৫০হিঃ/৮৬৪ ঈঃ এরপর বাগাদাদ নগরী মরমী আন্দোলনের কর্মকেন্দ্রে পরিণত হয়। এ বছরেই সর্বপ্রথম ধর্মীয় আলোচনা এবং যিকর আযকারের হালকা অনুষ্ঠানের জন্য মাসজিদগুলিতেও সূফীবাদের উপর আলোচনা এবং বক্তৃতা দানের সূচনা হয়।' (ইসলামী বিশ্বকোষ) এখানে উল্লেখযোগ্য যে, যে কাজগুলো ২৫০ হিজরী সনে ইসলামে অনুপ্রবেশ করল, সেগুলো সম্পাদন করলে কি কোন মুসলিম সওয়াবের

আশা পোষণ করতে পারেন? এরা ঢিলা-ঢালা পোষাকের ছদ্মাবরণে ইসলামে বৈরাগ্যবাদের আমদানী করেছে। পীর ফকীরদের এ বৈরাগ্যবাদ যা সূফীবাদ নামে আখ্যায়িত এগুলো গ্রীক দর্শন, ইরানীয় দর্শন এবং ভারত বর্ষের রামানুজ থেকে ধার করে নেয়া হয়েছে। এদের মতে, ধর্মের আচার অনুষ্ঠান পালন অপেক্ষা মনের সংকল্পটাই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। **(সূফী তত্ত্বের অন্তরালে ভূমিকা-১ পৃঃ)**

এ নবাবিষ্কৃত ও নবোদ্ভূত পদ্ধতিতে ধ্যান-তাপস্যা করতে গিয়ে বায়েজীদ বোস্তামী বলেনঃ "আমার এ পরিধেয় বস্ত্রের নীচে এক আল্লাহ ভিন্ন আর কিছুই নেই। তিনি আরো বলেনঃ সমস্ত প্রশংসা আমার, কি মহিমাময় আমার মর্যাদার নিশ্চয়ই আমিই আল্লাহ আমি ব্যতীত উপাস্য আর কেউ নেই; সুতরাং আমারই বন্দেগী কর। নাউযুবিল্লাহ।" **(ঐ ১৫ পৃঃ)** পরবর্তীকালে মনসূর হাল্লাজ 'আনাল হক' 'আমি সত্য' বলে আল্লাহ হবার দাবী করেন। পরবর্তীকালে এদের কয়েকজন সূফী গাউসুল আযম উপাধি ধারণ করেছেন। অর্থাৎ বিপদ আপদের সময় সবচেয়ে বড় ত্রাণকর্তা। এই গাউসুল আযম সূফীদের মতে, এ ত্রাণকর্তাই নাকি আল্লাহর সমস্ত প্রশাসন ক্ষমতা হস্তগত করে রেখেছেন। এর আদেশ ছাড়া নাকি পৃথিবীতে কোন কিছুই সংঘটিত হয় না। যাঁরা এরূপ ধ্যান ধারণা পোষণ করেন, প্রকৃত পক্ষে তারা কুরআন ও সন্নাহকে অস্বীকার করে থাকেন। আবার এসব তপ-যপ পদ্ধতির মাধ্যমে নাকি এরা পরমাআত্মার সত্তায় বিলীন হয়ে যেতে পারেন। রসূল (সঃ) আল্লাহর সত্তায় বিলীন হতে পারেননি, কিন্তু ভুঁই ফোড় সূফী আল্লাহর সত্তায় বিলীন হয়ে গেছেন? **(সূফীতন্ত্রের অন্তরাল ভূমিকা ১ ও ২ পৃঃ)**

সূফীরা মনে করে কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণ অপেক্ষা অন্তর দ্বারা আনুগত্য বরণই শ্রেয়। এ কারণেই কুরআন হাদীস বিশারদ পণ্ডিতগণ ও ফকীহ বিদ্বানগণ এদেরকে কাফিররূপে আখ্যায়িত করেছেন। এরা নিজেদেরকে বাতিনীপন্থী নামেও চিহ্নিত করে থাকেন। এদের কেউ মুরীদানকে সান্ত্বনা দিয়ে থাকেনঃ ক্ববরে মুনকার নকীরের সাওয়াল জওয়াবের সময় পীর সাহেব ক্ববরে ফিরিশতার আকারে যাবেন এবং মুরীদানকে উদ্ধার করবেন। কথিত আছে চরমোনাই পীরের ধারণা ও আকীদা অনুরূপ। আরো কথিত আছে আট রশীর পীরের দরগাহে 'লে খাজা' বলে গরু জবাই করা হয়-**(সূফী তত্ত্বের অন্তরালে ভূমিকা-২ পৃঃ)**

এ সূফী তত্ত্বের অন্তরালে যে শিরকের বীজ বপন করা হয়েছে, এগুলো মানলে ও বিশ্বাসকরলে কুরআন ও সুন্নাহর বর্ণনানুযায়ী পরকালে নাজাত পাবার আশা একেবারেই নেই। **(ঐ ২ পৃঃ)**

'সূফীবাদ' জাতীয় পুস্তকে দেখা যায় যে, প্রাথমিক যুগের সূফীগণ আল্লাহকে ভয়ের বস্তু মনে করতেন। ভীতির আতিশয্যে তারা আল্লাহর প্রতি প্রেম নিবেদন করতেও অসমর্থ ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে প্রেম নিবেদন করাই সূফী তত্ত্বের প্র'ধান বৈশিষ্ট্য হয়ে পড়ে। তাদের এ প্রেম নিবেদন পদ্ধতি সম্পূর্ণভাবে স্বকপোল কল্পিত। মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর প্রেমনিবেদন প্রদ্ধতির সাথে এর কোনও সাদৃশ্য নেই। যে আমল নবী মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম-এর দেখানো পথে করা হয়নি, যে আমল রসূল (সঃ)-এর আমলের সাথে সাদৃশ্য নেই, যে পদ্ধতি রাসূল (সঃ) গ্রহণ করেননি, সে পদ্ধতি যে অভিনব বিদ'আত তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

(সূফী তত্বের অন্তরাল- ৯ পৃঃ)

বুখারী শরীফের 'বাবুল কিতাবুল ইলম' অধ্যায়ে আবূ হুরাইরা (রাঃ) সাহাবী আলী (রাঃ)-কে প্রশ্ন করে বলেনঃ 'আপনার কাছে কি কোন লিখিত পুস্তক আছে? উত্তরে তিনি বলেন ঃ না। বুখারী শরীফে 'জিহাদ ও ভ্রমণ' অধ্যায়ে আলী (রাঃ)-এর একটি বক্তৃতা উদ্ধৃত করা হয়। হাদীসটি নিম্নরূপ।

আলী (রাঃ) ইট নির্মিত একটি মিম্বারে আরোহণ পূর্বক বক্তৃতা করেন। তখন তাঁর কাছে একটা তরবারী ছিল। তাতে একটা পত্র সংযুক্ত ছিল। তিনি বলেনঃ 'আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমাদের কাছে আল্লাহর কিতাব এবং এ পত্রে যা আছে তাছাড়া পড়ার যোগ্য আর কিছু নেই। অতঃপর তিনি সেটাকে (পত্রটাকে) সম্প্রসারিত করলেন। তাতে লেখা ছিল (যাকাত নেয়ার জন্য) উটের বয়স, আয়র থেকে সওর পর্যন্ত মদীনা পবিত্র ও সম্মানিত। যে কেউই এখানে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করবে তার প্রতি আল্লাহর, ফিরিশতা মণ্ডলীর এবং মানব জাতির অভিসম্পাত। সে পত্রে এটাও লেখা ছিল যে, মুসলিমদের নিরাপত্তা নিয়ম এক রকম, যার জন্যে তাদের নিকটবর্তী ব্যক্তি শ্রম সাধনা করবে। যে কেউ-ই কোন মুসলিমের কৃত অঙ্গীকারকে নসাৎ করবে তার প্রতিও আল্লাহর, ফিরিশতামণ্ডলীর এবং মানব জাতির অভিসম্পাত। আল্লাহ অনুরূপ ব্যক্তির কোন বিনিময় গ্রহণ করবেন না। সে পত্রে আরো উল্লেখ ছিল যে, যে সব দাস তাদের মনিবের আইনসম্মত অনুমতি ছাড়াই অন্যের সাথে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হয়, তা হলেও তাদের উপর আল্লাহর, ফিরিশতামণ্ডলীর ও মানব জাতির অভিসম্পাত। ক্বিয়ামত দিবসে তার কোন বিনিময় গ্রহণীয় হবে না।"**(বুখারী, হা ২৯৩৪ ও ২৯৪১ আবূ দাউদ)**।

বুখারী ও আবূ দাউদের হাদীসে গোপন বিদ্যার সামান্যতম সন্ধান ও সংবাদ পাওয়া গেল না। এখানে সিনাদার সিনা বিদ্যা প্রাপ্ত হবার কোন সংবাদ নেই। তরবারির খাপে রক্ষিত পত্রখানাতে গোপন বিদ্যার সামান্যতম সংবাদও নেই। এরা শুধু গুজব ছড়িয়ে তিলকে তাল করে এবং সম্পূর্ণভাবে ভারতীয়, গ্রীক ও ইরানীয় দর্শনকে কেন্দ্র করে উপাসনার একটা নুতন ও অভিনব পন্থা আবিষ্কার করে 'সূফীবাদ' নামে আখ্যায়িত করেছেন মাত্র। ইসলামের কুরআন ও সুন্নাহর বর্ণিত ইবাদতের পন্থা ছাড়া অন্য কোন উপায় অবলম্বন করলে তা ইবাদতরূপে গণ্য হবে না। **(সূফী তত্বের অন্তরালে-১০, ১১ পৃঃ)**

পীর-ফকীরদের শরীয়াত ও মারিফাতের দোহাই ভ্রান্ত

শরীয়াতকে 'ইলমে জাহির' (প্রকাশ্য জ্ঞান) এবং তরীকত বা মারিফাতকে ইল্‌মে বাতিন (গোপন জ্ঞান) বলে অবিহিত করে দ্বীন ইসলামকেই দ্বিধাবিভক্ত করে দেয়া হয়েছে। এক শ্রেণীর জাহিল তরীকত পন্থী বলতে শুরু করেছে যে, ইসলামের আসলই হল তরীকত মারিফাত, আর এই হাকীকত। এই হাকীকত কেই যদি লাভ করতে পারল, তাহলে তাকে শরীয়াত পালন করতে হয় না, সে তো আল্লাহকে পেয়েই গেছে। তাদের মতে শরীয়াতের আলিম এক, আর মারিফাত বা তরীকতের আলিম অন্য। এই তরীকতের আলিমরাই উপমহাদেশে পীর নামে অভিহিত হয়ে থাকেন। এ ধারণা প্রচার করা হয় যে, কেউ যদি শরীয়তের আলিম হয় আর সে তরীকতের ইল্‌ম না জানে- কোন পীরের নিকট মুরীদ না হয়, তবে সে ফাসিক।

এসম্পর্কে মুজাদ্দিদ আলফেসানী শায়খ আহমদ সরহিন্দীর নিকট থেকে, জানতে চাইব তাঁর মতামত। কেননা পাক-ভারতে তিনি একদিকে যেমন তাসাউফ বা ইলমে মারিফাতের গোড়া তেমনি আকবরী 'দ্বীনে ইলাহীর' ফিতনা ও ইসলাম দুশমনীর সয়লাবের মুখে তিনি প্রকৃত দীন-ইসলামকে জাগিয়ে তুলেছিলেন। কাজেই তাসাউফ সম্পর্কে তাঁর মতামতের গুরুত্ব 'আপনি আমি বা অন্য কারো তুলনায় অনেক বেশী। তার মত পেশ করা এজন্যেও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ যে, এ দেশের পীরেরা সাধারণত তাঁকেই সব পীরের গোড়া বলে দাবি করে থাকেন। শরীয়াত ও মারিফাত পর্যায়ে তিনি তার **'মকতুবা'-এ লিখেছেনঃ** কাল ক্বিয়ামতের দিন শরীয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, তাসাউফ সম্পর্কে কিছুই জিজ্ঞাসা করা হবে না। জান্নাতে যাওয়া ও জাহান্নাম থেকে রক্ষা পাওয়া শরীয়াতের বিধান পালনের উপর নির্ভরশীল। নবী রাসূলগণ- যাঁরা গোটা সৃষ্টিলোকের মাঝে সর্বোত্তম- শরীয়াত কবুল করারই দাওয়াত দিয়েছেন,। পরকালীন নাযাতের জন্য শরীয়াতকেই একমাত্র উপায় বলে ঘোষনা করেছেন। এ মহামানবদের দুনিয়ায় আগমনের উদ্দেশ্য হল শরীয়াতের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা। সবচেয়ে বড় নেকীর কাজ হল শরীয়াতকে চালু করা এবং এর আদেশ সমূহের মধ্যে একটি হুকুমকে হলেও জিন্দা করার জন্যে চেষ্টা করা। বিশেষ করে এমন সময়, যখন ইসলামের নাম নিশানা মিটে গেছে, কোটি কোটি টাকা আল্লাহর পথে খরচ করাও শরীয়তের কোন একটি মাসলাকে রেওয়াজ দেয়ার সমান সওয়াবের কাজ হতে পারে না।

মুজাদ্দিদে আলফেসানী (রঃ) এ পর্যায়ে আরো একটি প্রশ্নের বিশদ ও স্পষ্ট জবাব দিয়েছেনঃ

সাধারণ্যে প্রচলিত মত-জাহিল পীর ও তাদের মুরীদেরা প্রচার করে বেড়ায় যে, শরীয়াত হচ্ছে দ্বীনের বাইরের দিকের চামড়া, আর আসল মগজ হচ্ছে তরীকত বা মারিফাত। একথা বলে- যাঁরা শরীয়াতের আলিম, কিন্তু তরীকত, মারিফাত ইত্যাদির ধার ধারেন না, শরীয়তকেই যথেষ্ট মনে করেন- তাঁদের

'ফাসিক' ও বিদয়াতী ইত্যাদি বলে অভিহিত করে তাদের সমালোচনা করে এবং তাঁদের দোষ গেয়ে বেড়ায়। এর জওয়াবে **মুজাদ্দিদে আলফেসানীর- দাঁতভাঙ্গা উত্তর শুনন। তিনি বলেনঃ** শরীয়তের তিনটি অংশ রয়েছে। ইলম (শরীয়তকে জানা), আমল (শরীয়াত অনুযায়ী কাজ) এবং ইখলাস (নিষ্ঠা)। তরীকত ও হাকীকত উভয়ই শরীয়তের এই তৃতীয় অংশ ইখলাসের পরিপূরক হিসাবে শরীয়াতের খাদেম মাত্র। কিন্তু সকলে এতদূর বুঝতে সক্ষম হয় না। অধিকাংশ জাহিল লোক কল্পনার সুখ- স্বপ্নে বিভোর হয়ে আছে, আর বেহুদা অর্থহীন ও অকাজের কথাবার্তা বলাই যথেষ্ট মনে করে। এ লোকেরা মাহাত্ম্য ও মর্যাদার পূর্ণতা কি বুঝবে, তরীকতের হাকীকতই বা এরা কি বুঝবে! এরা শরীয়াতকে 'চামড়া' বা বাইরের জিনিস মনে করে বসে আছে, আর হাকীকতকে মনে করে নিয়েছে মগজ মূল ও আসল। আসল ব্যাপার কি, তা এরা আদৌ বুঝতে পারছে না। সূফী লোকদের, পীরদের বেহুদা অর্থহীন কথাবার্তা নিয়ে অহমিকায় নিমগ্ন রয়েছে ও মারিফাতের "আহওয়াল' ও মাকামাত" এর মধ্যে পাগল হয়ে ঘুরে মরছে তারা। আল্লাহ তা'য়ালা এ লোকদেরকে সঠিক পথে হিদায়াত করুন।

(সুন্নাত ও বিদ'আত মাও আঃ রহীম ১৪২-১৪৪ পৃষ্ঠা)

প্রখ্যাত অলী- আল্লাহ্ হযরত জুনাইদ বাগদাদী এ মারিফাত-এর মূল্যহীনতা আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেনঃ

اَلْعِلْمُ اَرْفَعُ مِنَ الْمَعْرِفَةِ وَاَتَمُّ وَاَكْمَلُ تُسَمَّى اللّٰهُ بِالْعِلْمِ وَلَمْ تُسَمَّى بِالْمَعْرِفَةِ وَقَالَ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٌ لَمَّا خَاطَبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاطَبَهُ بِاَتَمِّ الْاَوْصَافِ وَاَكْمَلِهَا وَاَشْمَلِهَا لِلْخَيْرَاتِ فَقَالَ فَاعْلَمْ اَنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ علما وَلَمْ يَقُلْ فَاعْرِفْ لِاَنَّ الْاِنْسَانَ قَدْ يَعْرِفُ الشَّيْءَ وَلَا تُحِيْطُ بِهِ عِلْمًا وَاِذَا عَلِمَهُ وَاَحَاطَ بِهِ عِلْمًا فَقَدْ عَرَفَهُ

(كتاب الميثاق، كتاب الطراسين، صـ ١٩٠)

মারিফাতের তুলনায় ইল্ম অনেক উন্নত, সম্পূর্ণ ও পূর্ণ। আল্লাহ্ নিজে ইল্ম এর নামে অভিহিত হয়েছেন, মারিফাতের নামে নয়। (অর্থাৎ কুরআনে আল্লাহ্ عالم، عليم কে বলা হয়েছেঃ কিন্তু عارف বা عريف বলা হয়নি। এ নিশ্চয়ই অর্থহীন নয়) আর তিনি বলেছেনঃ যারা ইল্ম লাভ করেছে, তাদেরই উচ্চ মর্যদা।

হযরত জুনাইদের এ কথার সারমর্ম হল এই যে, মারিফাতের চাইতে 'ইলম' বড়। অতএব, আল্লাহ্র মারিফাত নয়, আল্লাহ্ সম্পর্কে ইল্ম হাসিল

করতে হবে। 'ইল্ম' হাসিল হলেই 'মারিফাত লাভ হতে পারে। আর যার ইল্ম নেই, সে মারিফাতও পেতে পার না। এ ইল্ম-এর একমাত্র উৎস হল আল্লাহ্র কুরআন এবং রাসূলের হাদীস। কুরআন হাদীসের মধ্যেমেই আল্লাহ্কে জানতে হবে এবং আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করার ফলেই মানুষ পারে আল্লাহকে জানতে ও চিনতে। অন্য কোন উপায়ে নয়।

সূফীদের ভ্রান্ত ধারণার নমুনা

১। তাদের অনেকে ধারণা করে যে, জান্নাত ও জাহান্নাম তাদের হাতের মধ্যে। সূসূফী নামে এক সূফী বলেনঃ 'আমার হাতের মধ্যে জাহান্নামের দরজাগুলো, যেগুলো আমি বন্ধ করে রেখেছি এবং আমার হাতেই জান্নাতুল ফেরদাউস, যার দরজা খুলে রেখেছি। যে আমার যিয়ারতে আসবে তাকে সেখানে বাস করার অনুমতি দেবো।'

২। আবূ ইয়াজীদ আল বুস্তামী বলেন, আমি চাই যে, কিয়ামত যেন ঘটে যায় এবং আমি আমার তাঁবুকে জাহান্নামের উপর স্থাপন করি। তখন তাকে এক ব্যক্তি প্রশ্ন করে, কেন তা করবেন হে আবূ ইয়াজিদ। উত্তরে বললেন, আমি অবশ্যই জানি যে যদি জাহান্নাম আমাদেরকে দেখে তবে অবশ্যই ঠাণ্ডা হয়ে যাবে এবং সমস্ত সৃষ্টির জন্য আমি রহমত বনে যাব।

৩। তাদের ভ্রান্ত ধারণার মধ্যে এও আছে যা তারা সর্বান্তঃ করণে বিশ্বাস করে তা হল, দেওয়ান, কুতুব, গাউসদের কথা। তাদের আক্বীদা হচ্ছে কুতুবরাই দুনিয়ার সমস্ত কিছু নিয়ন্ত্রণ করে। যার কথা বলেছে দিবাগ الدباغ তিনি বলেন, দেওয়ান গারে হেরায় বসেন আর গাউস গুহার বাইরে বসে এবং চারজন কুতুব তার ডান দিকে বসে। তারা হলেন তার কর্মকর্তা এবং তিনজন তার বাম পার্শ্বে বসে। এক এক জন এক এক মাযহাব থেকে এবং দেওয়ানদের ভাষা হচ্ছে সির-ইয়ানি। যদি এ সমস্ত দেওয়ানরা একত্রিত হয় তখন এই বলে সিদ্ধান্ত নেয় যে, আগামীকাল আবার একই সময়ে একত্রিত হবে। তারা দুনিয়ার জগৎ এবং আসমানের জগৎ সব কিছুকেই নিয়ন্ত্রণ করে। এমনকি আল্লাহ পাক যে সত্তরটা পর্দা দ্বারা আবৃত আছেন তাও তারা নিয়ন্ত্রণ করে। মানুষ এবং মানুষের চিন্তা ভাবনাকেও তাঁরা নিয়ন্ত্রণ করে। সূফীদের অনুমতি ছাড়া তাদের কথা কেউ চিন্তাও করতে পার না।

৪। তাদের বিকৃত আক্বীদার মধ্যে আরো আছে আউলিয়া নবীদের থেকেও উত্তম। **(সূত্রঃ তাওহীদ বা একত্ববাদ- শাইখ আহমাদ আব্দুল লতীফ- ৪৫, ৪৬ পৃঃ)**

পীরদের সিলসিলা

হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণের পুত্র হয় ব্রাহ্মণ, পুরোহিতের পুত্র হয় পুরোহিত। ব্রাহ্মণই পৌরহিত্য করার একমাত্র অধিকারী। কেননা হিন্দু ধর্মমতে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মার মুখ হতে উৎপন্ন হয়েছে। সেজন্য ব্রাহ্মণকে বলা হয় বর্ণ শেষ। পাণ্ডিত্য থাক আর না থাক, কিছু যায় আসে না। পৌরহিত্য করাটা হচ্ছে ব্রাহ্মণের বংশগত ব্যাপার। ব্যাহ্মণ মরে গেলে তার ছেলে হয় পুরোহিত। ছেলে মরে গেলে তার ছেলে, এভাবে বংশাক্রমে এ পৌরহিত্য চলতেই থাকে।

বলাবাহুল্য হিন্দু সমাজের মত আমাদের সমাজেও এক শ্রেণী দেখা যায় আর সেটা হচ্ছে এই পীর বংশ। পীর বংশের সবাই পীর, পীর বাবা, পীর মা, পীর দাদা, পীর দাদী, পীর ভাই, পীর বোন ইত্যাদি- সবাই পীর। পীরে পীরে সব একাকার। পীর সাহেব মারা গেলে তাঁর ছেলে হয়ে যান গদ্দীনশীন পীর। ঠাকুর বা ব্রাহ্মণের মতোই বংশানুক্রমে পীরগিরি চলতে থাকে।

আল্লাহর অলী ও শয়তানের অলী

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ* اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ*

"হে নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ তা'আলার অলী, তাদের কোন ভয় নাই, আর না হবে তারা পেরেশান। (এরা হচ্ছে) যারা ঈমান এনেছে এবং আল্লাহকে সর্বদা ভয় করে।" **(সূরা ইউনুস ঃ ৬৩ আয়াত)**

এ আয়াত থেকে জানা যাচ্ছে যে, আল্লাহর অলী হচ্ছেন ঐ ব্যক্তি যিনি মু'মিন মুত্তাকী এবং পাপ কাজ হতে নিজেকে বিরত রাখেন। তিনি সর্বদা তাঁর রবকে এককভাবে ডাকেন এবং তাঁর সাথে কাউকেই শরীক করেন না। যখন প্রয়োজন হয় তখনই আল্লাহ তা'আলা আপন ইচ্ছায় তার মাধ্যমে কারামত প্রকাশ করেন যেমন ঈসা (আ)-এর মা মরিয়াম (আঃ)-এর ঘরে সর্বদা রিযিক আসত গায়িব হতে।

তাই অলীত্ব সত্য। কিন্তু অলী হবেন ঐ ব্যক্তি যিনি মু'মিন, আল্লাহর অনুগত এবং একত্ববাদী। এটা সত্য নয় যে অলী হওয়ার জন্য তার দ্বারা কেরামতি প্রকাশ পাবে। কারণ কুরআন পাক ও এধরনের কোন শর্তের কথা উল্লেখ করেনি। এটা কোন অবস্থাতেই সম্ভব নয় যে, কোন ফাসিক কিংবা মুশরিক ব্যক্তির মধ্যে অলীত্ব প্রকাশ পাবে। কারণ যে ব্যক্তি মুশরিকদের মত আল্লাহকে ছেড়ে অন্যের নিকট দু'আ করে, সে কেমন করে আল্লাহ তা'আলার সম্মানী অলী হতে পারে? আর কারামত বাপদাদার নিকট থেকে ওয়ারিশ সূত্রে পাওয়া কোন বস্তু নয়। বরং এটার সাথে জড়িত ঈমান ও নেক আমল। অনেক সময় দেখা যায় যে, ভণ্ড ফকীররা তাদের শরীরের মধ্যে লোহা ইত্যাদি প্রবেশ করাচ্ছে অথবা আগুন গিলে খাচ্ছে। আসলে এগুলো হচ্ছে শয়তানের কাজ। নিজেদের স্বার্থ হাসিলের জন্য তারা এ ধরণের উদ্ভট কার্যকলাপ প্রদর্শন করে কেরামতি বলে চালিয়ে দিচ্ছে। এ সমস্ত কাজ দ্বারা বরং তারা ক্রমান্বয়ে গোমরাহীর অতল তলে তলিয়ে যাচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা বলেঃ

قُلْ مَنْ كَانَ فِى الضَّلٰلَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمٰنُ مَدًّا*

"(হে নবী) বলুন! যে ব্যক্তি গোমরাহীর মধ্যে আছে আল্লাহর তার গোমরাহীর রাস্তাকে আরও প্রশস্ত করে দেন।" **(সূরা মারয়ামঃ ৭৫ আয়াত)**

পীর ফকীরদের পাপ মোচনের দাবী ধৃষ্টতা ছাড়া কিছুই নয়

ইসলামী শরীয়ত মতে পীরদের পাপমোচন করার দাবীগুলো ধৃষ্টতা ছাড়া কিছুই নয়। কারণ মানুষের পাপমোচন করার অধিকার কোন পীরকে দেয়া হয়নি। পাপমোচন করার শক্তি কোন মানুষের, কোন মালাইকা (ফিরিশতা), কোন অলী দরবেশের নাই। পাপমোচনের একমাত্র অধিকারী মহান আল্লাহ। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেনঃ

وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهُ*

কোন ঈমানদার মুসলিম যখন কোন অশ্লীল পাপ কাজ করে বসে অথবা নিজেদের আত্মার উপর জুলুম করে বসে তখন তারা আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আল্লাহর কাছেই ক্ষমা চায়, কেননা আল্লাহ ছাড়া গোনাহ্ মাফ করার কে আছে?
(সূরা আল- ইমরানঃ ১৩৫ আয়াত)

মহাসম্মানিত সর্বশ্রেষ্ঠ রসূলকেও আল্লাহ তা'আলা পাপ মোচনের অধিকার দেননি। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে-

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ جَاءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا*

"পাপীরা যদি রাসূলের কাছে এসে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায় আর রসূলও যদি তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চান, তাহলে আল্লাহকে তারা ক্ষমাশীল করুণাময়রূপে পাবে। **(সূরা আন-নিসাঃ ৬৪ আয়াত)** এ থেকে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে, পাপমুক্ত করার শক্তি রসূল (সঃ)-কেও দেয়া হয়নি।

তাই কুরআন হাদীস মতে পীর পুরোহিতদের দাবীগুলো ঠিক নয়, কারণ পাপ মোচন করার শক্তি কোন মালাইকার (ফিরিশতার) নাই, কোন জ্বীনের নাই, কোন নবী রাসূলের নাই আর অলী দরবেশদেরতো প্রশ্নই আসে না। একমাত্র মহান গফু-রুর রহীম আল্লাহ তা'আলাই পাপ মোচনের অধিকারী, অন্য কেহ নয় এবং হতেও পারে না। অতএব পাপ মোচন করার দাবী পীর ফকীরদের মিথ্যা ও প্রতারণা ছাড়া কিছুই নয়। কোন কোন পীর- ফকীর ভক্তদের পাপের বোঝা বহন করবেন বলে সান্ত্বনা বা 'গ্যারান্টি' দিয়ে থাকেন। তাঁদের এ দাবীও পীরগিরি বহাল রাখার এক ফন্দি ছাড়া কিছু না। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেনঃ

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّبِعُوْا سَبِيْلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطٰيٰكُمْ وَمَا هُمْ بِحٰمِلِيْنَ مِنْ خَطٰيٰهُمْ مِّنْ شَيْءٍ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ*

"কাফিররা মু'মিনদেরকে বলতো আমাদের পথে চল, আমরা তোমাদের পাপের বোঝা বহন করব। কিন্তু তারা তাদের একটুমাত্র বোঝাও বহন করার শক্তি রাখে না, তারা মিথ্যুক।" (সূরা আন্-কাবুতঃ ১২ আয়াত)

হাদীসে উল্লেখ আছে, আল্লাহর রসূল (সঃ) নিজের বংশের সকলকে আর বিশেষ করে আপন চাচা আব্বাস (রাঃ)-কে, আপন ফুফু সফীয়াকে ও আপন মেয়ে ফাতিমাকে ডেকে বলেছিলেন, তোমরা আল্লাহর কাছ থেকে নিজেদেরকে মুক্ত কর। কেননা তোমাদেরকে উদ্ধার করার ব্যাপারে আমি তোমাদের কোন কাজে লাগব না। হে ফাতিমা, এখন আমার মাল থেকে যা ইচ্ছে নিতে পার, কিন্তু জেনে রেখ, আল্লাহর কাছে আমি তোমার কোনই কাজে লাগব না।

(মুসলিম শরীফ)

তাই যিনি সৃষ্টির সেরা, যিনি সাইয়্যেদুল মুরসালীন, সেই প্রিয় রসূল মুহাম্মাদ মোস্তাফা (সঃ) যদি ক্বিয়ামতের দিনে নিজের মেয়ে ফাতিমার দোষক্রটির দায়িত্ব গ্রহণ করতে অক্ষমতা প্রকাশ করেন, তাহলে কোন সাহসে এক শ্রেণীর পীর ফকীর নামধারীরা ক্বিয়ামতের মাঠে ভক্তদের পাপের বোঝা বহন করার স্পর্ধা দেখাতে পারেন?

পীরদের হিদায়াত করার দাবী চরম মিথ্যা ও ভণ্ডামী

পীররা মুরীদদের হিদায়িত করার দাবী করেন। কিন্তু হিদায়িত করার শক্তি পীর-ফকীরদের তো দূরের কথা, আল্লাহ্রসূলও পাননি। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাঁর নবীকে বলেছেন-

اِنَّكَ لَا تَهْدِىْ مَنْ اَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ*

"হে রসূল! আপনার প্রিয়জন যদি কেউ থাকে, আর তাকে হিদায়াত করার একান্ত ইচ্ছা যদি আপনার থাকে, তাহলে আপনি তাকে হিদায়িত করতে পারবেন না। কেননা হিদায়িত আল্লাহর হাতে।" (সূরাঃ আল-কাসাস ৫৬ আয়াত)

তাই হিদায়েত করার দাবী পীরদের চরম মিথ্যা ও ভণ্ডামী।

পীর ফকীরদের অসিলা (মাধ্যম) হবার দাবী ঈমান হরণের ফাঁদ

পীররা অসিলা (মাধ্যম) হবার দাবী করে কিন্তু পীর বা পুরোহিতের অস্তিত্ব ইসলামে নেই। প্রত্যেক মুসলিম স্বয়ং তার পুরোহিত। প্রত্যেক মুসলিমকে মহান আল্লাহর সাথে সরাসরি আদ্যাত্মিক সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। কিন্তু পীর-ফকীররা কুরআনের 'ওয়াবতাগু ইলাইহিল ওয়াসিলাতা' এর অপব্যাখ্যা করে

বলে যে, আল্লাহ এ আয়াত দ্বারা পীর ধরার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। যদি এই আয়াতাংশ দ্বারা পীর ধরার কথা হয় তাহলে আল্লাহর রসূল (সঃ)-এর "ওয়াস আলুলিয়াল অসিলাতা ইল্লাল্লাহি" অর্থাৎ আমার জন্য তোমরা আল্লাহর কাছে ওয়াসিলা চাও কথার মানে কি? তিনি কি এই উক্তি দ্বারা তার জন্য পীর ধরিয়ে দিতে বলেছেন? আবার আযানের দু'আয় আ-তি মুহাম্মাদানিল অসীলাতা দ্বারা আমরা কি মুহাম্মাদ (সঃ)-কে একজন পীর ধরিয়ে দেয়ার জন্য আল্লাহকে অনুরোধ করি? নিশ্চয় না। **অসিলা অর্থ হচ্ছে নৈকট্য**। আল্লাহর ই'বাদত বন্দেগীর দ্বারাই করতে হবে। এ প্রসঙ্গে শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (রহঃ) বলেন, অসিলা অর্থ হচ্ছে আল্লাহর নৈকট্যের নাম। তাফসীরে জালালাইনে এর অর্থকরা হয়েছে- ইবাদত বন্দেগীর দ্বারা আল্লাহর নেকট্যের নাম অসিলা তাফসীরে মাদারীকে অসিলা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে- অসিলা ঐ কাজের নাম যার দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা বিখ্যাত তাফসীর ইবনু কাসীরে বলা হয়েছে আল্লাহ্র নৈকট্যের নাম অসিলা। কুরআনের তাফসীর কারকদের মধ্যে এসম্পর্কে কোন মতভেদ নেই। এছাড়াও কামুস নামক বিখ্যাত আভিধানগ্রন্থে বলা হয়েছে বাদশাহ মহান আল্লাহর নৈকট্যের নাম আসিলা **(সুন্নাত ও বিদআত, পীরতন্ত্রের আজব লীলা ১১ ও ১২ পৃঃ)**

মোট কথা অভিধান ও তাফসীরের কিতাব থেকে এ কথাই জানা যায় যে, অসিলা ঐ সব ই'বাদত ও সৎকর্মের নাম, যা আল্লাহর নৈকট্য লাভে সহায়ক হয়। আল্লাহকে পেতে হলে সৎকর্ম ও ই'বাদত, কুরআন ও হাদীসের নির্দেশের মাধ্যমেই পেতে হবে। এমন নয় যে, কোন মানুষ মাঝখানে রেখে প্রার্থনা করে শেষ পর্যন্ত তার কাছেই চাইতে শুরু করে দিবে।

আল্লাহ্কে পাওয়ার জন্যে রাসূলের অনুসরণে শরীয়াত পালন ছাড়া দ্বিতীয় কোন মাধ্যমে কোন অবকাশই নেই, তার কোন প্রয়োজনও নেই। বান্দার দু'আ আল্লাহ্র নিকট সরাসরি পৌঁছে যায়, আল্লাহ্ সরাসরিভাবে বান্দার দু'আ ক্ববুল করে থাকেন, সে জন্যে তিনি কোন মাধ্যম গ্রহণ করতে বলেননি, দু'আ ক্ববুল হওয়ার জন্যে তিনি কোন মাধ্যম গ্রহণের শর্তও আরোপ করেন নি। বরং এ পর্যায়ের যাবতীয় বিভ্রান্তি ও ভুল আক্বীদা দূর করে দিয়ে তিনি স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেনঃ

وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِىْ عَنِّىْ فَاِنِّىْ قَرِيْبٌ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِىْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِىْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ

"হে নবী, আমার বান্দা যদি তোমার নিকট আমার বিষয়ে জিজ্ঞেস করে, তবে বলে দাও আমি অতি নিকটে, কোন দু'আকারী যখন আমাকে ডাকে তখন আমি তার দু'আই জবাব দেই- দু'আ কবুল করি। অতএব, আমারই নিকট জবাব পাইতে চাওয়া তাদের কর্তব্য এবং আমার প্রতিই তাদের ঈমান রাখা উচিত। তাহলে সম্ভবত তারা সঠিক পথে চলতে পারবে।" (সূরাঃ বাকারাহ ১৮৬)

আল্লাহ্-ই সব দু'আ- প্রার্থনাকারীর দু'আ কবুল করেন, কেবল তাঁরই নিকট দু'আ করে তাঁরই নিকট থেকে তাঁর জবাব পেতে চেষ্টা করা উচিত, এ কথাই বলা হয়েছে এ আয়াতে। আল্লাহ্র নিকট কোন মাধ্যম ছাড়া পৌছা যায় না বলে বিদয়াতীরা যে ধারণা সৃষ্টি করেছেন তার মূলোৎপাটন করা হয়েছে এ আয়াতে। 'দু'আকারীর দু'আ আমিই কবুল করি' বলে আল্লাহ্ তা'আলা স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিলেল যে, আল্লাহ্র নিকট দু'আ করতে এবং দু'আ কবুল করাতে কোন অসীলার প্রয়োজন নেই। সঠিক ভাবে আল্লাহ্র নিকট দু'আ করতে পারলে আল্লাহ্ সরাসরিভাবেই তা কবুল করে থাকেন।

ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ (রঃ) বলেছেন- 'রাজা ও প্রজাদের মধ্যে যেমন মধ্যস্থ ধরা হয়, তেমনি আল্লাহ ও তাঁর বান্দার মধ্যে মধ্যস্থ ধরা হারাম। যারা কাফির, যারা মুশ্‌রিক ও যারা বিদআ'তী, তাদের ধারণা ধ্যান তাপস্যা রাজা আর প্রজাদের মধ্যে যেমন আড়াল বা ব্যবধান থাকে, ঠিক তেমনি আল্লাহ আর তাঁর বান্দার মধ্যে আড়াল বা ব্যবধান আছে। যারা সাধারণ মানুষ, হিদায়িতের ব্যাপারে, রুযি-রোযগারের ব্যাপারে বা অন্যান্য দরকারী ব্যাপারে সরাসরি আল্লাহর কাছে আবেদন জানানোর অধিকার তাদের নেই, কাজেই মাঝে একটা মধ্যস্থের দরকার। এই মধ্যস্থের মাধ্যমেই তাদেরকে প্রার্থনা জানাতে হবে। তারা আরো মনে করে, এই মাধ্যম দ্বারা আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে হিদায়িত করে থাকেন ও রুযি-রোযগার বিতরণ করে থাকেন। অতএব সাধারণ লোক এই মধ্যস্থদের কাছে আকুল আবেদন জানাবে আর মধ্যস্থগণ তাদের আবেদন আল্লাহর কাছে পৌছে দিবে যেমন রাজার পরিষদরা লোকের আবেদন নিবেদন রাজার কাছে পৌছে দিয়ে থাকে। রাজার পারিষদরা রাজার সান্নিধ্যলাভ করার দরুন তাদের কথা যেমন রাজার কাছে অধিক কার্যকরী হয়ে থাকে, ঠিক তেমনি এই পীর ফকীরের দল মধ্যস্থরূপে আল্লাহর সান্নিধ্যলাভ করেছে বলে তাদের সুপারিশও আল্লাহর কাছে অত্যাধিক কার্য্যকরী হবে, এইরূপ ধারণা নিয়ে কোন ব্যক্তি কাউকে পীর, মুর্শেদ, গুরু বা পুরোহিত, যে নামেই হোক না কেন, মধ্যস্থ মান্য করলে সে কাফির ও মুশরিক হয়ে যাবে। তার তাওবা করা ওয়াজিব।

(রাসায়েলে সুগ্‌রা বরাতে পীরতন্ত্রের আজবলীলা- ৯, ১০ পৃঃ)

পীর ফকীরদের মূর্খতা

সারাদেশে যেখানে সেখানে রকমারী ভণ্ড-পীর ফকীরের আস্তানা রয়েছে। অজ্ঞ লোকেরা এদের কাছেই ধর্ণা দিয়ে নষ্ট করছে ঈমান। ঢেলে দিচ্ছে অর্থ। তাই এর চেয়ে লজ্জা কি হতে পারে? পীররা আল্লাহকে পাওয়ার জন্য মুরীদদেরকে তাদের নিকট বাইয়াত নেয়ায়। পীররা জনগণকে ধোঁকা দিয়ে থাকে যে পীরের বায়আত অবশ্যই করতে। পীরের বায়আত না করলে সে শয়তানের মুরিদ হবে, তারা বলে, যার পীর নাই শয়তান হচ্ছে তার পীর। **এই বইয়াত অর্থ হচ্ছে, আনুগত্যের প্রতিজ্ঞা করা বা বেচাকেনা**। মুরীদরা পীরের বাইয়া'ত নেয়র পর পীরের কথা অন্ধভাবে মানতে থাকে কেননা তারা নিজেদের বিক্রি করে দিয়েছে বা আনুগত্য করে চলার শপথ নিয়েছে।

আবার অনেক পীরদের কিবলা বলা হয়। এর মানে কি? কিবলাতো কেবলা কা'বা শরীফ যার দিকে ফিরে আমাদের সলাত (নামায) পড়তে হয়। কোন সাহাবী কি রসূল (সঃ)-কে কিবলা বলেছে? না। তাহলে পীরদের পীরকিবলা বলা অজ্ঞতা ও চরম অন্যায়। সবচেয়ে দুঃখের বিষয়- ভণ্ড পীর ও সূফীরা নিজেরা যেমন সাধারণত জাহিল (অজ্ঞ) হয়ে থাকে, মুরীদদেরকেও তেমনি জাহিল করে রাখতে চায় এবং তাদের দ্বীন- ইসলাম ও ইসলামী শরীয়াত সম্পর্কে কুরআন হাদীস থেকে জ্ঞান অর্জন করার জন্যে কখনো তাকিদ দেয় না। এসব তথ্য কথিত পীর কিবলার মুরীদকে মুরাকাবা করতে বলবে, আল্লাহর যিকির করতে বলবে এবং হাজার বার তাদের 'বানানো দরূদ শরীফের অজীফা' পড়তে বলবে; কিন্তু আল্লাহর কালাম দীন-ইসলামের মূল উৎস কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করতে, তার তরজমা ও তাফসীর বুঝতে, হাদীসের জ্ঞান আহরণ করতে এবং আল্লাহর কথার সাথে গভীরভাবে পরিচিত হতে কখনই বলবে না।

পীর ফকীরদের আজব কীর্তি

এক শ্রেণীর ভণ্ড পীর ফকীরের দাবী হলো কুরআন ত্রিশপারা নয় চল্লিশপারা। তারা বলে ত্রিশপারা মৌলবীদের কাছে আর দশ পারা আমাদের কাছে আছে। ঐ দশপারার মধ্যেই রয়েছে হকিকত (গুরুত্ব) ও মারিফাতের (গোপনীয়তার) আসল তত্ত্ব। আসল তত্ত্ব আমরা পেয়েছি মৌলবীরা শুধু ত্রিশপারা কুরআন নিয়ে কচুরীপানার মত ভেসেই বেড়াচ্ছে। পীর ফকীরদের মতে চার খলিফা (রাঃ), আ'ইশা (রাঃ), ইমামগণ, সাহাবায়ে কিরাম ও উলামায়ে কিরামরা কেহই আসল তত্ত্ব পাননি। একমাত্র তত্ত্ব পেয়েছে এই পীর ফকীরের দল। এরা আরো বলে যে, ঐ দশপারা লিখিত নেই। এগুলো খুব গোপন ব্যাপার তাদের সিনায় সিনায় এগুলো সব চলে আসছে।

এই ভণ্ড পীর ফকীরদের কল্পিত দশপারার গুপ্ত তত্ত্ব এত ঘৃণিত, ন্যাক্কারজনক ও সামঞ্জস্যহীন যে তার বর্ণনা করারও ঘৃণ্য ও লজ্জাকর ব্যাপার। কিন্তু সমাজে অবগতির জন্য অনিচ্ছা সত্ত্বেও কয়েকটি তুলে না ধরে পারছি না।

(১) এদের প্রথম কথা হল, ত্রিশপারা কুরআনে যে 'বিসমিল্লাহ' লেখা আছে, সেটা আসল কথা নয়। আসল কথা তাদের সিনায় আছে, তা হল 'বীজ্‌মে আল্লাহ্' অর্থাৎ বীর্যের মধ্যে আল্লাহ (নাউযুবিল্লাহ)। সেজন্য তারা বীর্য বা ধাতুকে নষ্ট করা মহাপাপ বলে মনে করে এবং নিজেদের বীর্য নিজেরা খেয়ে ফেলে। ভারতের পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জিলার বিখ্যাত পুঁথি সাহিত্যিক মুনশী ফসিহুদ্দীন তাঁর কিতাবে এদের ' প্রেমভাজা' খাওয়ার কথা লিখেছেন। আটার মধ্যে বীর্যপাত করে সেই আটা দিয়ে রুটি বানিয়ে পীর মুরীদ সকলেই খুশী মনে খায়, তাকেই বলে ' প্রেমভাজা'। এই সব পীরের আখড়ায় কোন লোক গেলে তাকে একটু কিছু খেতেই হবে। খেতে না চাইলে পীর বাবাজী শত অনুরোধ করে হালুয়া হোক, রুটি হোক বা অন্য কিছু হোক, একটু তাকে খাওয়াবেই এবং সেই খাবারে পীর বাবাজীর একটু বীজ থাকবেই। কেননা গোপন দশ পারায় আছে "বীজ্‌মে আল্লাহ।" **(মাওলানা আবূ তাহের বর্ধমানী রচিত 'পীরতন্ত্রের আজবলীলা' পুস্তকের ২২ পৃঃ)**

(২) নদীয়ার প্রখ্যাত পুঁথি সাহিত্যিক তাঁর কিতাবে 'লাল সাধনা' বলে আর একটা জিনিসের কথা উল্লেখ করেছেন, সেটাও নাকি পীরদের গোপন দশপারায় লেখা আছে। মেয়েদের মাসিক রক্তস্রাব হলে সে রক্ত ফেলে দেয়া চলবে না, নাক চোখ বন্ধ করে খেতে হবে - একে বলে 'লাল সাধন'। তাছাড়া অমাবস্যার রাত্রিতে যদি কোন মেয়ের প্রথম মাসিক ঋতস্রাব হয়, তাহলে ঐ রক্তমাখা ন্যাকড়া একটু করে ছিঁড়ে নিয়ে পানিতে ভিজিয়ে রেখে, উক্ত পানি বা পানির শরবত আগত লোকদের খাইয়ে থাকে। শুনা যায় এতে নাকি আগত লোকের চিত্ত- বিভ্রম ঘটে যায় এবং ঐ ব্যক্তি তার অজ্ঞাতেই নাকি পীরের অন্ধভক্ত হয়ে যায়। (ঐ ২২-২৩ পৃষ্ঠা)

(৩) পীর ফকীরদের কল্পিত দশপারার আরও গোপন কথা হচ্ছে, শরীরের কোন জায়গায় নখ চুল কাটা যাবে না। চুল দাড়ির জন্য চিরুনী ব্যবহার করতে হবে না। তাতে মাথার চুল জটা হয় হোক, দাড়িতে জটা হয় হোক, তাতে কান ক্ষতি নেই বরং জটার অধিকারী হওয়া সৌভাগ্যের বিষয়। এরা আরও বলে, রসূল (সঃ) যখন মিরাজে গিয়েছিলেন, তখন কি তিনি ক্ষুর, কাঁচি চিরুনী, নাপিত সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন? তিনি কি গা ধুয়েছিলেন? তাহলে গোসলের কি দরকার? নখ চুল কাটার বা চিরুনী দিয়ে চুল দাড়ি আঁচড়াবার কি দরকার? (ঐ ২৩ পৃঃ)

(এসব ভণ্ড পীর ফকীরদের কর্মকাণ্ড কুফরী-আর এদের সম্পর্কে মহিউদ্দিন আঃ কাদির জিলানী (রঃ) (যাকে তারা পীরকুল শিরোমনি বলে) তার ফতহুল গায়িব নামক কিতাবের ৮ পৃষ্ঠায় লিখেছে- অর্থাৎ শরীয়ত যে মা'রিফাত বা হাকিকতের সাক্ষ্য দেয় না- সে মা'রিফাত কুফর।) আমরা দেখছি, উক্ত ভণ্ড পীরদের কোন কথা বা কোন আচরণকে শরীয়ত সমর্থন করে না। শরীয়তের কোন জায়গায় লেখা নেই যে, দশপারা কুরআন গুপ্তভাবে আছে। ভণ্ড পীরদের দশপারা কুরআন ও তাদের বক্তব্যগুলি উদ্ভট কল্পনা প্রসূত। প্রতিটি দৃশ্যমান বস্তু যে স্রষ্টার অংশ বিশেষ, মানুষ যে নবরূপী নারায়ন-এ কথা শ্রীমৎ শংকরাচার্য্য বলে গছেন। অতএব যারা 'বীজমে আল্লাহ' বলে থাকে, যারা গুরু নামে আছে সুধা, যিনি গুরু তিনিই আল্লাহ বলে থাকে, তারা যে আসলে শংকরাচার্য্যের শিষ্য- এতে কোন সন্দেহ নেই। (ঐ-২৬, ২৭ পৃঃ) তাইএদেরকে মুসলিম বলে কখনোও কি অভিহিত করা যায়?

পীর ফকীররা কিভাবে কেরামতি দেখায় ও গায়িব বলে?

ভণ্ডপীর ফকীররা কখনো কখনো এমন কথা বা কাজ করে দেখান যা দেখে সাধারণ মানুষরা অবাক হয়ে যান। যেমনঃ

(১) কারো একটা কিছু হারিয়েছে তা খুঁজে পাচ্ছে না। তখন ভণ্ড-পীর ফকীরদের কাছে সে লোকটি যেতেই বলে দেয় তোর হারানো অমুক জিনিসটা ওখানে পাবি- একথা শুনে হারানো লোকটি ওখানে যেয়ে দেখে সত্যিই তার জিনিস রয়েছে। (২) কারো বাড়ীতে দুষ্ট জ্বিনের উপদ্রব আছে। কিন্তু চেষ্টা

তদ্বীর করেও তেমন ফল হল না। তখন সে মনে মনে ভাবলো একবার ঐ ভণ্ড-পীর ফকীরদের কাছে গেলে হতো। তাই এদের কাছে যাওয়াতেই অমনি বলে দিল, যার জন্য এসেছিস বুঝতে পরছি- যা আর তোকে কষ্ট দিবে না। সত্যি সত্যিই দেখা গেল, তারপর থেকে আর উৎপাত নেই।

(৩) আপনি কি দিয়ে ভাত খেয়েছেন, আপনার বাড়ীতে কি আছে, আপনার কেউ মারা গেছেন। ভণ্ড পীর-ফকীররা কিন্তু এসব দেখেনি। আপনি যেই তাদের কাছে গেলেন অমনি এসব কথা সে বলে দিল।

মোট কথা এ ধরণের বহু কীর্তিকাণ্ড এইসব ভণ্ড পীর-ফকীররা দেখিয়ে থাকে। আর এসব দেখে শুনে এক শ্রেণীর দুর্বল ঈমানের লোক অন্ধভক্ত হয়ে পীরের পায়ে উপুড় হয়ে পড়ে যায়।

ভণ্ডপীর বা ফকীর এসব কেরামতি ও গায়িবী খবর বলে থাকে শয়তানের কাছে থেকে শিখে বা নিজেই কিছু কেরামতি বের করে এবং জ্বীনদের কাছে থেকে শুনে এভাবেই তারা আল্লাহর অলী হিসাবে নিজেদের পরিচিত করে। এ সম্পর্কে আল্লাহ কুরআনে বলেনঃ

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ثُمَّ يَقُوْلُ لِلْمَلٰئِكَةِ اَهٰٓؤُلَاءِ اِيَّاكُمْ كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ * قَالُوْا سُبْحٰنَكَ اَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُوْنِهِمْ بَلْ كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ الْجِنَّ اَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُّؤْمِنُوْنَ* فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَّفْعًا وَّلَا ضَرًّا وَنَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ذُوْقُوْا عَذَابَ النَّارِ الَّتِىْ كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ*

সেদিন তাদের সবাইকে একত্রিত করা হবে, তারপর মালাইকাদের (ফিরিশতাদেরকে) বলা হবে এরাই কি সেই দল যারা তোমাদের পূজা করত? তারা বলবে, পবিত্র মহান আপনি। আপনিই আমাদের পরিচালক, আমরা আপনার দিকেই নিবিষ্ট রয়েছি, তাদের দিকে না, বরং তারা জ্বীনদেরই পূজা করত। তারা বেশীরভাগ তাদের উপরেই ঈমান রাখত। সুতরাং আজকে আর তাদের মধ্যে কেউ কারো লাভ লোকসানের কিছুমাত্র মালিক নয়। আর আমি সেই জালিমদের বলব, তোমরা সেই জাহান্নামের শাস্তিই ভোগ করতে থাক, যা তোমরা মিথ্যা জানতে।" **(সূরা সাবাঃ ৪০-৪২ আয়াত)**

এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হচ্ছে, মানুষ জ্বীনের সাহায্যে লাভ লোকসান, উপকার ও অপকার করতে পারে। মানুষ জ্বীনদের পূজা করে থাকে ও তাদের অলী হিসেবে মেনে নিয়ে বিভিন্ন রকমের কেরামতি শিখে। তাদের কাছে কিছুটা গায়েবী খবর শুনে নিয়ে মানুষদের শুনায়, যাতে মানুষ তাদেরকে সত্যিকার আল্লাহ তা'আলার অলী হিসেবে মেনে নেয় এবং সেই আসল দাতা মহান আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের কাছেই প্রার্থনা করে।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ

هَلْ اُنَبِّئُكُمْ عَلٰى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيٰطِيْنُ* تَنَزَّلُ عَلٰى كُلِّ اَفَّاكٍ اَثِيْمٍ*
يُّلْقُوْنَ السَّمْعَ وَاَكْثَرُهُمْ كٰذِبُوْنَ*

"আমি তোমাদেরকে বলে দিব কার উপরে শয়তান অবতরণ করে? প্রত্যেকটি গুনাহগারের উপরই শয়তান অবতরণ করে, যা কিছু শুনে তাই নিয়ে এসে বলে দেয়, আর সেগুলোর মধ্যে বেশীর ভাগই মিথ্যাবাদী।"

(সূরা শু'আরাঃ ২২১-২২৩ আয়াত)

এ আয়াত থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণিত হচ্ছে, যখন আল্লাহ তা'আলা ফিরিশতাগণ আকাশে সেই প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার নিকট থেকে দুনিয়াতে কখন কি হবে জানতে পারেন এবং একে অপরকে এই খবর বলে থাকেন তখন শয়তান অতি গোপনে সে সমস্ত খবর শুনে ভণ্ড পীর-ফকীরদের জানিয়ে দেয়। এই সুযোগে ভণ্ড পীর ফকীররা সে সব খবর কিছুটা মানুষদের বলে এবং পরে যখন মানুষের কাছে সত্য প্রমাণিত হয়, তখন তারা ঐ সমস্ত ফকীরদের সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করে নেয়।

মহান আল্লাহ বলেন

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ وَجَعَلْنٰهَا رُجُوْمًا لِّلشَّيٰطِيْنِ-
وَاَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيْرِ*

আর সেগুলোকে শয়তান মারার যন্ত্র হিসেবে বানিয়েছি। আর তাদের জন্য আমি জ্বলন্ত আগুনের সাজা তৈরী করেছি।" **(সূরা মুল্‌কঃ ৫ আয়াত)**

অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা তারকাগুলো শয়তানকে মারার যন্ত্র হিসেবে বানিয়েছেন। কারণ যখন মালাইকারা আকাশের উপর দুনিয়াতে কখন কি হবে সেই নিয়ে আলোচনা করতে থাকেন তখন শয়তান সমস্ত খবর চুপে চুপে শুনতে থাকে। যখনই মালাইকারা শয়তানের উপস্থিতি জানতে পারেন তখনই তাদের উপর অগ্নিপিণ্ড নিক্ষেপ করেন।

আ'ইশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিন বলেন, কিছু সংখ্যক লোক রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে গণকদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। তিনি বললেন, কিছুই নয়, (অর্থাৎ তাদের কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়, মিথ্যা)। লোকজন বলল, হে আল্লাহর রসূল ! তারা কোন কোন সময় এমন কথা বলে যা সত্য হয়ে যায়, তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, ঐ কথাটি আল্লাহর তরফ থেকে পাওয়া। জ্বীন তা তড়িৎ গতিতে শুনে নেয় এবং তার বন্ধু গণকের কানে বলে দেয় অতঃপর গণক ঐ কথাটির সাথে শত শত মিথ্যা মিলিয়ে প্রকাশ করে।

(বুখারী, মিশকাত হাঃ ৪৩৯১)

যারা গণক অথবা ভবিষ্যদ্বক্তাদের নিকট গিয়ে তাদের ভবিষ্যদ্বাণীকে সত্য বলে বিশ্বাস করল, তারা মুহাম্মাদ (সঃ)-এর প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে অর্থাৎ কুরআনকে অস্বীকার করল। **(আহমাদ, মিশকাত হাঃ ৪৩৯৭)**

প্রকৃতপক্ষে এরা শয়তানেরই পূজা করছে। এরা শয়তানদেরকে আল্লাহ শরীক বানিয়ে নিয়েছে, অথচ তাদেরকেও এ আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং তারা আল্লাহর সাথে তাঁরই মাখলূক বা সৃষ্টকে কি করে পূজা করছে। যে শয়তানকে আল্লাহ করুণা হতে দূরে নিক্ষেপ করেছেন, এবং সেই শয়তানই আল্লাহকে বলেছিল- আমি অবশ্যই আপনার বান্দাদেরকে পথভ্রষ্ট করব এবং তাদের বৃথা আশ্বাস প্রদান করবো, অতএব, যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভুলে গিয়ে শয়তানকে বন্ধুরুপে গ্রহণ করবে, সে নিশ্চয় প্রকাশ্য ক্ষতিতে নিপতিত হবে।

নিশ্চয় তারা কাফির হয়ে গিয়েছিলেন লাতকে আহ্বান করে যদিও লাত ছিল একজন সৎলোক। তারা তাকে আল্লাহর ছেলেও বলেনি বরং শুধু আহ্বান করেছিল তাতেই তারা কাফির হয়ে গেল। তেমনিভাবে যারা জ্বীনদের পূজা করে কাফির হয়েছে তারাও তাদেরকে আল্লাহর ছেলে বলেনি। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوْا لَهٗ بَنِيْنَ وَبَنٰتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ
سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يَصِفُوْنَ*

"এই অজ্ঞ লোকেরা জ্বীনকে আল্লাহর শরীক বানিয়ে নিয়েছে, অথচ ঐগুলোকে আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন, এবং তারা অজ্ঞতাবশত আল্লাহর প্রতি পুত্র-কন্যা আরোপ করে; তিনি পবিত্র- মহিমান্বিত! এবং তারা যা বলে তিনি তার উর্ধ্বে" **(সূরা আন-আমঃ ১০০ আয়াত)**

এ সমস্ত আয়াতসমূহ থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, পীর-ফকীরদের গায়িব বলা ও কেরামতি দেখানো আশ্চর্যের কিছু নয় এবং যারা ঐ সমস্ত কেরামতি দেখে ও গায়িবী খবর শুনে তাদেরকে সত্যিকার আল্লাহ তা'আলার অলী হিসেবে মনে নেয় তারাই বিপথগামী, পথভ্রষ্ট। তাছাড়া ঐ সমস্ত পীর ফকীররা শয়তানের কাছ থেকে বিভিন্ন রকম যাদু শিক্ষা করে মানুষের কাছে আল্লাহ তা'আলার নেক বান্দা হিসেবে পরিচিত হয়।

মহামানব সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল মুহাম্মদ (সঃ)-ও কোন গায়িবের খবর জানতেন না এ সম্পর্কে পবিত্র কালামে আল্লাহ তাঁর রসূল (সঃ)-কে বলেনঃ

قُلْ لَّا اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِيْ خَزَائِنُ اللّٰهِ وَلَا اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا اَقُوْلُ لَكُمْ اِنِّيْ
مَلَكٌ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰى اِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ اَفَلَا
تَتَفَكَّرُوْنَ*

"আপনি বলুনঃ আমি তোমাদেরকে একথাও বলছিনা যে, আমার কাছে আল্লাহর ভাণ্ডার সমূহ রয়েছে। কিংবা আমি গায়িবের খবর রাখি। আর এ কথাও বলছিনা যে আমি মালাইকা (ফিরিস্তা), আমি শুধু সেই হুকুমই মেনে চলছি, যা আমার কাছে অহী যোগে পৌছে থাকে। অন্ধ চক্ষুষ্মান ব্যক্তি কি সমান? কেন তোমরা চিন্তা কর না।" (সূরাঃ আন-আমঃ ৫০ আয়াত)

উল্লেখিত আয়াতে যখন বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার ভাণ্ডার ও ভবিষ্যতের খবর পয়গাম্বরকুল-শিরোমনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর হাতেও নেই, তাই কোন পীর, ফকীর, দরবেশ অথবা বুযুর্গ সম্বন্ধে এরূপ ধারণা পোষণ করা যে, তিনি যা ইচ্ছা করতে পারেন, ভবিষ্যতবাণী বলতে পারেন, যাকে ইচ্ছা দিতে পারেন, এ রূপ ধারণা সুস্পষ্ট মূর্খতা ও শিরকী বিশ্বাস ছাড়া কিছু নয়।

অনেকের ধারণা নবী ও আল্লাহ তা'আলার অলীগণ আমাদের সম্পর্কে অবগত আছেন। কিন্তু তাদের এ ধারণা সম্পূর্ণ মিথ্যা, বরং আমাদের ওঠা-বাসা, চলা-ফেরা ও সুখ-দুঃখের কথা কিছুই তারা জানেন না, যা সুস্পষ্টভাবেই আল্লাহ তা'আলার পবিত্র কালাম থেকে প্রমাণিত হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ فَيَقُوْلُ مَاذَا اُجِبْتُمْ قَالُوْا لَا عِلْمَ لَنَا اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ*

"আল্লাহ তা'আলা যেদিন রসূলগণকে একত্রিত করবেন আর তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন? তাঁরা বলবেন, আমরা তো কিছুই জানি না। আপনি অবশ্যই গায়িবের কথা ভাল জানেন।" (সূরা আল- মায়িদা ঃ ১০৯ আয়াত)

একজন মানুষ অন্য একজন মানুষের সামনে থাকা সত্ত্বেও তারা ঈমান ও কাজকর্ম সম্পর্কে প্রবল ধারণার ভিত্তিতেই সাক্ষ্য দিতে পারে, পূর্ণ বিশ্বাসের ভিত্তিতে নয়। কেননা আন্তরের গোপন বিষয় ও সত্যিকার ঈমান সম্পর্কে কেউ অহী ব্যতীত নিশ্চিতভাবে জানতে পারে না। নবী রসূল ব্যতীত আন্য কারো নিকট অহী আসে না। তারপরও আমরা কিভাবে একজন লোককে পীর-ফকীর, অলী-দরবেশ মনে করে তার মুরীদ হয়ে যাব? যে ব্যক্তি নিজেকে মুসলিম বলে দাবী করে, আল্লাহর নির্দেশাবলী অনুসরণ করে এবং ইসলাম ও ঈমান বিরোধী কোন কথা ও কর্মে জড়িত হয় না, রসূলগণ তাকে ঈমানদার ও সৎকর্মী বলতে বাধ্য ছিলেন, সে অন্তরে খাঁটি মু'মিন কিংবা মুনাফিক যাই হোক। অর্থাৎ নবী রসূলরাও গায়িব জানতেন না বলেই তো রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ আমরা তো বাহ্যিক কাজকর্ম দেখে বিচার করি, অন্তর্নিহিত গোপন রহস্যের মালিক হচ্ছেন আল্লাহ তা'আলা। (মা'আরিফুল কুরআন)

'ইলমে গায়িব সম্পর্কে জানার জন্য আমারা কি গণক ও জ্যোতির্বিদের বিশ্বাস করব ? না, আমরা তাদের বিশ্বাস করব না। কেননা এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ وَمَا يَشْعُرُوْنَ اَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ*

"(হে রসূল!) আপনি বলুন, আল্লাহ ব্যতীত কেউই আকাশ ও পৃথিবীতে গায়িব বা অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞান রাখে না এবং তারা জানে না কিয়ামত কবে হবে।" (সূরা আন-নামলঃ ৬৫ আয়াত)

যারা গণক অথবা ফকীরদের নিকট গিয়ে তাদের ভবিষ্যত বাণীকে সত্য বলে বিশ্বাস করল, তারা মুহাম্মাদ (সঃ)-এর উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে অর্থাৎ কুরআন মাজীদকেই অস্বীকার করল। কারণ, সুস্পষ্টভাবেই উল্লোখিত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা জানিয়ে দিয়েছেন।

عٰلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖ اَحَدًا * اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ فَاِنَّهٗ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ رَصَدًا *

"আল্লাহ ছাড়া আর কে উ গায়িবের খবর জানে না। তবে রসূলদের মধ্যে যাদেরকে যখন আল্লাহ তা'আলা কোন কিছু সম্পর্কে জানিয়ে দেন। তখন তিনি তার সামনে ও পেছনে প্রহরী নিযুক্ত করেন। (সূরা জ্বিনঃ ২৬-২৭ আয়াত)

আ'লিমুল গায়িব বিশেষণটি একমাত্র আল্লাহ তা'আলার বিশেষ গুণ। আর তিনি এ ব্যাপারে কাউকে অবহিত করেন না।

হস্তরেখা বিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, ভবিষ্যৎ কথন বিদ্যা দ্বারা ভবিষ্যৎ ঘটনাবলীর জ্ঞান অর্জন করা হয় অথবা আল্লাহর প্রকাশিত সত্য খবর জ্বিনের মাধ্যমে কেউ কেউ ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী জেনে ফলে অথবা মৌসুমী বায়ুর গতি প্রকৃতি দেখে আবহাওয়া বিশেষজ্ঞরা ঝড়-বৃষ্টি সম্পর্কে ভবিষ্যৎ বাণী করে এবং তা অনেকাংশে সত্যেও পরিণত হয়- এসব বিষয় জনসাধারণের দৃষ্টিতে "ইলমে গায়িব" তথা অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞান। তাই আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, কুরআন মাজীদে "ইলমে গায়িব" কে আল্লাহ তা'আলার বৈশিষ্ট্য বলছেন, অথচ বাস্তবে দেখা যায় যে, অন্যরাও তা অর্জন করতে পারে। কিন্তু এর উত্তর এই যে, যন্ত্রপাতির মাধ্যমে বিশেষজ্ঞদের আদৃশ্য বিষয় প্রকাশ পায় কিন্তু জনসাধারণ অজ্ঞ থাকে। এরপর উপকরণ যখন শক্তিশালী হয়ে যায়, তখন সবার দৃষ্টিতেই ব্যাপকভাবে প্রকাশ পায়। মোটকথা, চিহ্ন ও লক্ষণাদি দেখেই এসব বিষয়ের অস্তিত্বের খবর দেয় হয়। লক্ষণসমূহ প্রকাশ পাওয়ার পর আর সে গুলো অদৃশ্য থাকে না, বরং প্রত্যক্ষ বিষয়ে পরিণত হয়। তবে সূক্ষ্ম হওয়ার কারণে ব্যাপকভাবে প্রত্যক্ষকরা যায় না।

উপরোক্ত উপায়ে যে জ্ঞান অর্জিত হয়, তা সবকিছু সত্ত্বেও অনুমানের অতিরিক্ত কিছু নয়, 'ইলম বলা হয় নিশ্চিত জ্ঞানকে, তা এগুলোর কোনটির মাধ্যমেই অর্জিত হয় না। তাই এসব খবর ভুল হবার ঘটনাও অনেক।

জ্যোতির্বিজ্ঞানে যেসব বিষয় হিসাবের সাথে সম্পর্কযুক্ত তা জানা 'ইলম্ বটে, কিন্তু "গায়িব" নয়। যেমন হিসাব করে কেউ বলে দেয় যে, আজ পাঁচটা একচল্লিশ মিনিটে সূর্যোদয় হবে কিংবা অমুক মাসের অমুক তারিখে চন্দ্রগ্রহণ অথবা সূর্যগ্রহণ হবে। এ ছাড়া জ্যোতির্বিজ্ঞানের মাধ্যমে খবর জানিয়ে যে দাবী করা হয়, তা প্রতারণা বৈ কিছুই নয়। মোটকথা কুরআনের পরিভাষায় যাকে "গায়িব' বা অদৃশ্য বলা হয়, তা আল্লাহ ছাড়া কারোও জানা নেই। পক্ষান্তরে উপকরণ ও যন্ত্রপাতির মাধ্যমে মানুষ স্বভাবতঃ যেসব বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করে তা প্রকৃত পক্ষে "গায়িব" নয়, যদিও ব্যাপকভাবে প্রাকাশ না পাওয়ার দরুণ তাকে "গায়িব" বলেই অভিহিত করা হয়।

পবিত্র কুরআন থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণ পাবার পরও যদি কেহ সন্দেহ করে অথবা সামান্যও বিশ্বাস রাখে যে, নবী ও অলীগণ আমাদের সম্পর্কে সমস্ত খবর রাখেন, তাহলে তাকে অবশ্যই মুসলিম বলা যাবে না। কারণ সে সরাসরি কুরআনের আয়াতকে অস্বীকার করছে।

অলৌকিক কিছু দেখে ঈমান নষ্ট করা যাবে না

কোন পীর ফকীর যদি অতি কৌশলে তার ইন্দ্রজালের আশ্চর্য ভেলকী দেখিয়ে হাওয়ায় উড়ে যায়, নদীর উপর দিয়ে হেঁটে যায় আর পা যদি তার না ভিজে কিংবা আগুনে ঝাপিয়ে পড়ে অথচ একটা পশমও না পুড়ে, এমন আশ্চর্য কর্মকাণ্ড দেখে কি আমাদের বিদ্যা-বুদ্ধি, জ্ঞান-গরিমা, ঈমান-ধর্ম সবকিছু তার পায়ে লুটিয়ে দিব? না কখনো না। বরং তাকে আব্দুল কাদের জিলানী (রঃ)-এর মতে কুরআন হাদীস দিয়ে পরীক্ষা করে দেখাবো যদি সে কুরআন বা হাদীস বিরোধী কাজ করে তাহলে মনে করতে হবে সে মুহাম্মাদ (সঃ)-এর উম্মত নয় বরং সে ইবলিশ শয়তানের সাগরেদ বা চেলা।

যিকরের নামে ভণ্ডামী

পীর-ফকীরদের ছয় লতিফার যিকর এক নব আবিষ্কার। ইসলামে এর উৎস খুঁজে পাওয়া যায় না। 'উপনিষদের' পাতঞ্জলীতে' 'কুণ্ডলিনি' আছে, আর ছয় লতিফাকে তারই মতোই মনে হয়। যুগে যুগে অলী দরবেশগণ ইসলামী শরীয়তের অতিরিক্ত' 'মোরাকাবা মোশাহাদা' (ধ্যান) এবং এ জাতীয় আরও আমল করে থাকলেও তা সব আমাদের জন্য অনুসরণীয় নয়। আল্লাহর রসূল (সঃ) শুধু তাঁকে এবং তাঁর সাহাবাদের অনুসরণ করতে নির্দেশ দিয়ে গেছেন- অন্য কাউকে নয়। অবশ্য যাঁরা আল্লাহর রসূল (সঃ)-এর তাঁর সাহাবাদের অনুসরণ করেন তাদের তো অনুসরণ করতেই হবে। অলী দরবেশদের কোন আচরণ যদি রসূল (সঃ) এবং তাঁর সাহাবাদের অনুসরণের বহির্ভূত হয়, তবে তা

অনুসরণ করা যায় না। প্রচলিত পীর-মুরিদী প্রথা যে অতিরিক্ত আচরণ-তাতে কোন সন্দেহ নাই। সুর ও বাদ্য ইসলামে হারাম। রাগরাগিনীর সুরে হামদ্ নাত এমনকি কুরআন তিলাওয়াত করাও জায়িয নাই। ঢোল, তবলা, হারমোনিয়াম ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার শরীয়তে সম্পূর্ণ হারাম। অথচ কোন কোন পীর ফকীরের দরবারে গান বাদ্যকেই ইবাদতের উপকরণ গণ্য করা হয়। এমনকি যিকরের সময় ঢোল ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। যেন এই বাদ্যযন্ত্র ছাড়া আল্লাহর যিকর সম্ভব নয়। আল্লাহর স্মরণের মধ্যেও হারাম উপকারণ ঢোল বাদ্যের ব্যবহার হচ্ছে। প্রশ্ন উঠে সেখানে মানুষ আল্লাহর প্রেমে যিকর করে? না ঢোলের আকর্ষনে যিকর করে? **ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ (রহঃ) বলেন,** শুধু আল্লাহ বলা বা 'হু' বলা তার কোন মূল ভিত্তি নাই। এটা কোন ভাল বা খাস যিকর হতে পারে না- যিকর হওয়ার প্রশ্নই উঠতে পারে না বরং তার দ্বারাই নানা ধরনের বিদ'আত ও গোমরাহী ছড়ায়- (আল্লাহ পাকের দাসত্ব-১১৫) অতিরিক্ত কিছু করার প্রয়োজনই নাই। রাসূল (সঃ) কর্তৃক শিখানো শরীয়ত কি যথেষ্ট নয়? তাঁর শিখানো ইসলামী শরীয়ত আমল করলে কি আল্লাহর পছন্দনীয় হওয়া যায় না এবং এতেই কি মুক্তিপ্রাপ্তি সুনিশ্চিত হয় না? অথচ এটা সুনিশ্চিত যে, রাসূলের দেয়া শরীয়তকে যথেষ্ট মনে না করলে ঈমান থাকতে পারে না।

যিকরের সঠিক নিয়ম

আযান ছাড়া আল্লাহ যত প্রকার প্রশংসাসূচক শব্দ আছে সবগুলোর উচ্চারণ সাধারণ স্বরেই করতে হবে। খুব জোরে চলবে না। কুরআন ঘোষণা করছে, "লা তাযহার বি-সালা-তিকা ওলা- তুখা-ফিত বিহা ওয়াবতাগি বায়না যা-লিকা সাবীলা। অর্থঃ সলাতে (নামাযে) চীৎকার করে তিলাওয়াত করো না, আর একেবারে নিম্নস্বরেও তিলাওয়াত করো না। বরং দু'য়ের মাঝামাঝি পথ ধরো। **(সূরা বানী ইসরাঈলঃ ১১০ আয়াত)**

সলাতে যা কিছু পড়া হয়, সেগুলো অবশ্যই যিকরের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই এই আয়াত থেকে বুঝা গেল, বিকট চীৎকার করে যিকর করা হারাম।

একদিন আল্লাহ রসূল (সঃ) একটি টিলার উপর উঠছিলেন। এমন সময় তিনি একটি খচ্চরের পিঠে সাওয়ার ছিলেন। একজন সাহাবা ওই টিলায় উঠে উচ্চস্বরে বললেনঃ লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হা ওয়া আল্লাহ আক্ববর, তখন নবী (সঃ) বললেন, তোমরা তো কোন বধির এবং অনুপস্থিত সত্তাকে ডাকছো না। আল্লাহর রাসূল (সঃ) বললেন 'হে জনগণ, তোমরা নিজেদের প্রতি সদয় হয়ে খুব জোরে চীৎকার থেকে বিরত হও। জেনে রেখ, তোমরা এমন একজন শ্রবণকারী, দর্শনকারী ও নিকটবর্তীকে ডাকছো যিনি তোমাদের সাথে আছেন। (বুখারী হাঃ ৫৯৬১)

উল্লেখিত আয়াত ও হাদীস থেকে জানা যাচ্ছে যে, অর্থবোধক পূর্ণ বাক্য দ্বারা আল্লাহকে স্মরণ, আল্লাহর প্রশংসা ব্যঞ্জক পূর্ণবাক্য নিম্নস্বরে বা সাধারণ স্বরে

উচ্চারণ করাকেই যিকর বলে। আর অন্য কোন পন্থায় যা করা হয় বা হবে তা যিকর নয়- বিদআ'ত। যিকরের সঠিক পন্থা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

وَاذْكُرْ رَّبَّكَ فِىْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّخِيْفَةً وَّدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ وَلَاتَكُنْ مِّنَ الْغٰفِلِيْنَ-

"আপনি আপনার প্রভূকে আপনার মনে অত্যন্ত বিনীত ভীতভাবে যিকর (স্মরণ) করুন, উচ্চ শব্দে নয়, সকালে ও সন্ধ্যায়। আর গাফেলদের অন্তর্ভূক্ত হবেন না।" (সূরাঃ আল- আ'রাফঃ ২০৫ আয়াত)

وَادْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ -

"তোমরা তেমাদের প্রভূকে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে এবং গোপনে ডাকতে থাক। নিশ্চয় আল্লাহ সীমালংঘনকারীদিগকে ভালবাসেন না।"

(সূরা আল-আ'রাফঃ ৫৫)

যিকর আমাদেরকে করতে হবে। তবে যিকর কাকে বলে, সেটাই আগে জানার দরকার। **যিকর শব্দের অর্থ হচ্ছে স্মরণ করা বা ইবাদত কারা।**
(মিশকাত ৫ম খণ্ড-৮৮ পৃঃ)

যিকর করা অর্থ আল্লাহর সঙ্গে মনের যোগ সাধন করা, আল্লাহর নামের তসবীহ ও যিকর অর্থবোধক সম্পূর্ণ শব্দের দ্বারা করতে হবে।

আল্লাহর রাসূল (সঃ) বলেছেন, "আফযালুয যিকরে লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ, ওয়া আফযালুদ দু'আয়ে আলহামদু লিল্লা-হ।" সর্বশ্রেষ্ঠ যিকর হচ্ছে 'লা ইলা- হা ইল্লাল্লা-হ, আর সর্বশ্রেষ্ঠ দু'আ হচ্ছে 'আলহামদু লিল্লা-হ।
(ইবনু মাজাহ, মিশকাত ৫ম খণ্ড হাঃ ২১৯৮)

আল্লাহর রসূল (সঃ) আরো বলেছেন, যে ব্যক্তি দৈনিক একশত বার 'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ ওয়াহ্দাহু লা-শারীকালাহু লাহুল মুলক ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আ'লা-কুল্লি শায়ইন ক্বাদীর'- বলবে, সে ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা সারাদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত নিরাপদে রাখার ব্যবস্থা করবেন। **(বুখারী হাঃ ৫৯৫৫)**

আল্লাহর রাসূল (সঃ) বলেছেন, দু'টি বাক্য মুখে উচ্চারণ করতে খুব সহজ কিন্তু ওজনের পাল্লায় খুব ভারী আর রহমানের খুব প্রিয়, বাক্য দু'টি হচ্ছে "সুবহানাল্লা-হিল আযীম, সুবহানাল্লা-হি ওয়া বিহাম দিহী" **(বুখারী হাঃ ৫৯৫৮)**

আল্লাহর নবী (সঃ) আরো বলেছেন, যে ব্যক্তি তার প্রভুর যিকর করে, আর যে ব্যক্তি যিকর করে না, তাদের উপমা হচ্ছে, জীবিত ও মৃতের মত।
(বুখারী, হাঃ ৫৯৫৯)

দ্বিতীয় অধ্যায়

ক্বর না মাযার

আরবীতে পরিদর্শন স্থানকে মাযার বলা হয়। যে ক্বরকে কেন্দ্র করে উরস হয় সেই স্থানটি অজ্ঞ জনগণের কাছে মাযার নামে প্রসিদ্ধ ও বহুল পরিচিত। কুরআনের আয়াত সমূহে ও বিভিন্ন হাদীসে ক্বর যিয়ারতের কথা আছে কিন্তু সেখানে কোথাও মাযার যিয়ারত শব্দ নেই। আর কবরবাসীকে কোন কিছু শুনানোও সম্ভপর নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَمَا اَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِى الْقُبُوْرِ-

"যে ব্যক্তি ক্বরে পড়ে আছে তাকে আপনি শোনাতে পারেন না।"
(সূরাঃ ফা-ত্বির ঃ ২২ আয়াত)

তোমরা ক্বরকে সামনে রেখে সলাত পড়ো না এবং ক্বরের উপর বসো না। **(মুসলিম)**

আরবীতে 'মাযা-র' শব্দটির শাব্দিক অর্থ যিয়ারতের জায়গাও হয়। কিন্তু কুরআন হাদীসের পরিভাষায় 'মাযার' শব্দটি ক্বর যিয়ারতের জায়গা হিসেবে ব্যবহৃত হয়নি। বরং তা পরিদর্শন ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। তাই ক্বরের সঠিক অর্থ মাযার হয় না।

ক্বর পূজার সূচনা

বেশীর ভাগ মাযার ও এ জাতীয় স্মৃতিসৌধগুলো ফাতিমীদের শাসনামলে ৪০০ হিজরীতে তৈরী হয়েছে। বিশ্ববিখ্যাত তাফসীরকারক ইবনু কাসীর তাদের সম্বন্ধে বলেনঃ কাফির, ফাসিক, পাপিষ্ঠ, ধর্মত্যাগী, বেদীন, মুনাফিক, আল্লাহ তা'আলার সিফাত অস্বীকারকারী এবং ইসলামের অস্বীকারকারী অগ্নি পূজকদের মতো তারা ছিল কাফির তাদের যামানায় তারা দেখে যে মুসল্লীরা মাসজিদ পূর্ণ করে ফেলছে। অথচ তারা সলাতও পড়ত না এবং হাজ্জ্বও করতো না। মুসলিমদের উপর হিংসা করত; ফলে তারা চিন্তা করলো মানুষদেরকে মাসজিদ হতে সরিয়ে দেয়ার। ফলে তারা মিথ্যা মাযার ও কুব্বা বানাতে শুরু করল। লোকদের মধ্যে ঐ ধারণা করালো ঐ সমস্ত গুলোতে হোসেন (রাঃ) ও জয়নাব (রাঃ)-এর ক্বর। তাদের মধ্যে অনেক উৎসবের ব্যবস্থা করল যাতে মানুষ তাদের দিকে আকৃষ্ট হয়। নিজেদেরকে ফাতিমী নামে অখ্যায়িত করল যাতে মানুষের চোখ হতে নিজেদের ঢেকে রাখতে পারে। অন্য মুসলিমরা তাদের থেকে এই বিদআ'ত নিয়েছে যা তাদেরকে শিরকের মধ্যে নিক্ষেপ করে। সে সময় থেকেই ক্বর পূজার সূচনা হয়। এভাবেই এ রীতি মুসলিম সমাজে ছড়িয়ে পড়ে।

(আল-ফিরকাতুন নাজীয়াহ- মুহাম্মাদ বিন জামিল যাইনু বাংলায় অনুদৃত- ৫৩ পৃঃ)

ক্বর পূজা ও টাকা আদায়ের ফন্দি

মুসলিম নামধারী একদল লোক ক্বরকে পাকা করে তার উপর আবার মাযার বানাচ্ছে, সেই মাযারে সাধারণ জনগণের যাতায়াতের ব্যবস্থা করে ধূর্ত লোকগুলো মানুষকে শোষণ করে। তারা প্রচার করে যে, মাযারের অভ্যন্তরে শায়িত ব্যক্তি আল্লাহর অলী ছিলেন, তাঁর কাছে প্রার্থনা জানালে মনোবাসনা পূর্ণ হয়। যেমন খাজা মঈনুদ্দিন (রঃ)-এর মাযারে লিখা আছে 'কেউ ফিরে না খালি হাতে, খাজা বাবার দরবার হতে'। অজ্ঞ এবং নিরীহ মানুষ সে কথা বিশ্বাস করে ক্বরকে সিজদা করে মাযারের ধূলা গায়ে মাখে এবং মাযার পরিচালক তথাকথিত খাদেমদের অকাতরে টাকা পয়সা দিয়ে যাচ্ছে এই অর্থ দিয়েই খাদেম নামে ধূর্ত লোকগুলো ধনী হচ্ছে।

মৃতব্যক্তি জীবিতদের কিছুই করতে পারে না। সাধারণ মানুষ তা জানে না। এমনটি যদি হতো যে, মানুষ দলে দলে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর এর রওজায় গিয়ে তাঁর কাছে অনেক কিছু চাইত এবং তিনিও তাদের প্রার্থনানুযায়ী মনের বাসনা পূর্ণ করে দিতেন তা কিন্তু ভাবনাতীত। কোথায় কেউ তো কোন দিন রাসূল (সঃ)-এর রওজায় কিছু চাইলো না আর তিনিও কাউকে কিছু দিলেন না। এমতাবস্থায়, পীর-দরবেশরা ক্বরে থেকে মানুষকে কি দিতে পারবেন? আল্লাহর রসূল (সঃ) ক্বর পাকা করতেই নিষেধ করেছেন, কোন সাহাবা (রাঃ)-এর ক্বরও পাকা করা হয়নি এবং সে ক্বরের গিয়ে কেউ পূজাও করে না। মাযার পরিচালক এবং মাযার পূজারীরা কি জানেনা যে, সাহাবাগণের (রাঃ)-এর মর্যাদা এত ঊর্ধ্বে যে, পরবর্তী এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত এসব ভন্ড পীর-দরবেশ ও আউলিয়াগণ কোন একজন সাহাবা (রাঃ)-এর ঘোড়ার পায়ের নীচের ধূলার সমকক্ষ হতে কখনো পারবেন না।

মাযারে টাকা দেয়া বেওকুফী। আজকাল পথভ্রষ্ট মানুষগুলো সেই মাযারে নেকীর উদ্দেশ্য বহু ধন- সম্পদ দিয়ে থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয় মানুষ একটুও চিন্তা করে না যে, এ টাকা কোথায় দিচ্ছে, কেন দিচ্ছে। যদি সে ক্বরবাসীকে নেক ব্যক্তি ভেবে টাকা দিয়ে থাকে তবুও তো কোন লাভ হচ্ছে না। কারণ, তিনি তো দুনিয়া থেকে চলেই গেছেন, তার কাছে আর টাকা পৌঁছে না। পীর ফকীর বা বুযুর্গের ক্বরে যেখানে হয়তো কোন ক্বরই নেই কিন্তু প্রতারক শ্রেণীমানুষকে ধোঁকা দিয়ে নেক ব্যক্তির ক্বর বলে চালিয়ে দিচ্ছে, সেখানে প্রায় গিয়ে যিয়ারত করে আসেন। টাকা পয়সা সেই ব্যক্তি পাচ্ছে না, ধোঁকাবাজু অন্য লোক পকেট ভরে চলছে।

নবী- রাসূল ও অলীদেরও মৃত্যু হয়

আল্লাহ তা'আলার পবিত্র কুরআনের আয়াত থেকে জানা যায় যে, নবী হোক আর অলী হোক সবারই মৃত্যু আছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলেনঃ

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ اَفَائِن مِّتَّ فَهُمُ الْخٰلِدُوْنَ. كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ –

"আপনার আগেও কোন লোককে চিরস্থায়ী করিনি। সুতরাং আপনি যদি মারা যান তাহলে তারা কি বেঁচে থাকবে? প্রত্যেক জীবনকে মরণের স্বাদ গ্রহণ করতে হবে।" **(সূরাঃ আম্বিয়াঃ৩৪-৩৫ আয়াত)**

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ অবশ্যই আমারও মৃত্যু হবে যেমন আমার পূর্বের নবীদের মৃত্যু হয়েছে। (বুখারী)

এ সম্পর্কে একটি ঘটনা তুলে ধরছিঃ যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মৃত্যু সংবাদ উমার (রাঃ) শুনলেন, তখন তাঁর মাথা বিগড়ে গেল আর তিনি তার খোলা তলোয়ার নিয়ে বের হয়ে বলতে লাগলেন, যে বলবে রাসূলুল্লাহ (সঃ) মারা গেছেন তাকেই আমি হত্যা করব। ভয়ে কেউই উমার (রাঃ)-এর কাছে যেতে সাহস করেননি। তখন আবূ বকর (রাঃ) বলেছিলেন, "যে মুহাম্মাদের ই'বাদত করতো সে জেনে রাখুক যে মুহাম্মাদ অবশ্যই মারা গেছেন, আর যে আল্লাহ তা'আলার ই'বাদত করতো, সে জেনে রাখুক যে আল্লাহ তা'আলা চিরঞ্জীব, তাঁর মৃত্যু নেই।" এরপর আয়াত পড়ে শুনালেন ঃ

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ اَفَائِنْ مَّاتَ اَوْقُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰى اَعْقَابِكُمْ،

" মুহাম্মদ একজন রাসূল মাত্র; তাঁর আগে বহু রাসূল গত হয়েছে। সুতরাং যদি তিনি মারা যান অথবা নিহত হন তবে তোমরা কি পৃষ্ঠ প্রদর্শণ করবে।" **(সূরাঃ ইমরান- ১৪৪)**

যারা ধারণা করে থাকে নবীদের অথবা অলীদের মৃত্যু নেই, তারা আসলে জীবিত, তাদের জন্য উপরে উল্লেখিত আয়াত ও ঘটনাটিই কি যথেষ্ট নয়?

কাজেই আল্লাহ তা'আলার পবিত্র কুরআন থেকে দলীল প্রমাণ পাওয়ার পরও কারো এ ধারণা রাখা উচিত হবে না যে, নবী অথবা নেক ব্যক্তিগণ জীবিত আছেন।

মৃত ব্যক্তি কিছু শুনতে বা করতে পারে না

মৃত ব্যক্তিগণ মানুষের আহ্বান বা প্রার্থনা শুনতে পান কি? না, তারা মানুষের প্রার্থনা শুনতে পান না।

আল্লাহ তা'আল বলেনঃ – إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى

"মৃত ব্যক্তিকে তুমি কোন কথা, (কোন আহ্বানই) শুনাতে পারবে না।"
(সূরা আন-নামলঃ ৮০- আয়াত)

তাই মৃত ব্যক্তি (ক্বরস্থ) আমাদের কোন কথাই শুনতে পান না অথচ ঐ মৃত ব্যক্তির কাছে দু'আর আশা করা বা তার ক্বররের পাশে শিরণি বা তবারক বণ্টন করা যে মারাত্মক অন্যায় তা সহজেই বুঝা যায়।

তাছাড়া মৃতু ব্যক্তি যে সর্ব প্রকার ক্ষমতাই হারিয়ে ফেলেন এ সম্পর্কে প্রখ্যাত সাহাবী আবূ হুরাইরা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, যখন মানুষ মরে যায়, তখন তার সমস্ত আমলই বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তিনটি আমল ব্যতীত।

(১) সদকায়ে জারিয়া (অর্থাৎ যে সদকা দ্বারা সদকা দানকারীর মৃত্যুর পরও মানুষ উপকৃত হতে থাকে। যেমন- রস্তাঘাট তৈরী করা, মাসজিদ, মাদ্‌রাসা প্রভৃতি নির্মাণ করা)। (২) ইল্‌ম যার দ্বারা লোকের উপকার হয় (অর্থাৎ দ্বীনী ইল্‌ম শিক্ষা দেয়া)। (৩) নেক সন্তান যে তার জন্য দু'আ করে। (অর্থাৎ পিতা-মাতার জন্য দু'আ করে ও তাদের জন্য দান খয়রাত করে)। **(মুসলিম)**

এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মৃত্যুর পর সকল মানুষের সমস্ত কর্মক্ষমতাই বন্ধ হয়ে যায়।

কাজেই পৃথিবীতে জীবিতকালে আলিম উলামাদের কাছে দু'আ নেয়ার মত মনে করে, ঐ মৃত আলিম, মওলানা, ফকীর দরবেশের কাছে দু'আ চাওয়া অন্যায়। আর যদি কেউ মনে করে তারা নিজেরাই আমাদের বিপদে সাহায্য করতে পারেন, তাহলে অবশ্যই শির্ক হবে।

অনেকেরই ধারণা যে, নবী ও আল্লাহ তা'আলার অলীগনের অবশ্যই কান রয়েছে যা দিয়ে তারা শুনতে পায়? তারা সমস্ত খবর রাখে এবং তারা কবরে জীবিত অবস্থায় আছেন। তাদের ধারণা যে ক্বরস্থ অলীগণ তাদের ভাল মন্দে সাহায্য করে থাকেন।

এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا – * أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا*

"(আল্লাহকে) বাদ দিয়ে যাদেরকে তোমরা ধারণা করছ, তাদের ডেকেই দেখ না, তারা তোমাদের দুঃখ কষ্ট মোটেই দূর করতে সক্ষম নয়, আর কোন ক্ষমতাও ওদের নেই। এরা যাদেরকে ডাকছে, তারা নিজেরাই নিজেদের পালনকর্তার দরবারে পৌছানোর উপায় খুঁজে বেড়াচ্ছে, তাদের মধ্যে কে বেশী ঘনিষ্ঠ হতে পারে আর তাঁরই মেহেরবানী কামনা করছে, তাঁর আযাবকেও ভয় করছে। কথা সত্যি যে আপনার পালনকর্তার আযাব ভয় করার মতই।"
(সূরা বনি ইসারাঈলঃ ৫৬-৫৭ আয়াত)

আয়াত থেকে আরও সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে,ক্বরস্থ ব্যক্তিগণ আমাদের কিছুমাত্র উপকার করতে তো পারেই না বরং আমাদের সম্পর্কে তারা কিছুই অবগত নন।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ*

"তারচেয়ে বেশী গোমরাহী আর কে-ই বা হতে পার, যে ব্যক্তি আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাকে ডাকছে, সে ক্বিয়ামত পর্যন্ত তার ডাকে সাড়া দেবে না, আর তাদের দু'আ সম্পর্কে তারা খবরও রাখে না।" **(সূরা আহ্‌কাফঃ ৫ আয়াত)**

يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ*

"যে দিন রসূলগণকে একত্রিত করবেন আর তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন, তোমরা কি উত্তর পেয়েছিলে? তারা বলবেন, আমরা কিছুই জানি না। আপনি অবশ্যই গায়িবের কথা ভাল জানেন।" **(সূরা আল-মায়িদাঃ ১০৯ আয়াত)**

এছাড়াও আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ*

"(নবী বলবেন) আমি যতদিন তাদের মধ্যে ছিলাম ততদিনই আমি তাদের খোঁজ-খবর নিয়েছি। তারপরে যখন আমাকে দুনিয়া থেকে তুলে নিলেন, তখন আপনি (আল্লাহ) তাদের খোঁজ-খবর রেখেছেন। আপনিই সব কিছুর খবর রাখেন।" **(সূরা আল-মায়িদাঃ ১১৭ আয়াত)**

যারা মাযারে গিয়ে বলতে থাকে, বাবা পীর সাহেব আমার অমুক আশাটা পূরণ করে দাও। তারা একটুও চিন্তা করে না যে, তাদের এ আবদার ঐ বাবা শুনতে পাচ্ছে কিনা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ * إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ

"যদি তোমরা তাদেরকে ডাকো, তবু তারা তোমাদেরকে ডাক শুনবে না।"

(সূরাঃ আল-ফ-তির ঃ ১৪ আয়াত)

উপরোল্লিখিত পবিত্র কুর্আনের বেশ কয়েকটি আয়াত থেকে প্রমাণিত হলো যে, মৃত্যুর পর নবী ও আল্লাহ তা'আলার অলীগণ সমস্ত কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন। অতএব, মানুষের বিপদে ও মুসীবতে ক্ববরস্থ ব্যক্তিদের কাছে যে কোন দু'আ ও আবেদন করলে তারা সাহায্য তো করতে পরেনই না, বরং তাদের কাছে যে আবেদন করা হচ্ছে তাও তারা জানেন না, শুনেন না, উপলব্ধি করতে পারেন না। তাই প্রমাণিত হচ্ছে আল্লাহ তা'আলাকে বাদ দিয়ে ক্ববরস্থদের ডাকলে কোন লাভ হয় না।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ * أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ

"আল্লাহ কি যথেষ্ট নয় তার বান্দার জন্যে? (সূরা আয্-যুমারঃ ৩৬ আয়াত) এ আয়াত থেকে আমরা জানতে পারি যে, যাদের কাছে আমরা সাহায্য প্রার্থনা করব তারা আমাদের কোন প্রকার সাহায্য করতে পারে না, তার পরেও যদি অন্যের কাছে সাহায্য চাওয়া হয়, তাহলে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা'আলার সাহায্য যথেষ্ট নয়, নাউযুবিল্লাহ।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ *

"হে রসূল আপনি বলুন আমি নিজেরও কোন খারাপ কিংবা ভাল করার ক্ষমতার মালিক নই। আল্লাহ তা'আলা যা ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত।" **(সূরা ইউনুসঃ ৪৯ আয়াত)**

দেখা যায় আজকাল বহু মুসলিম যখনই বিপদে পড়ে তখনই মাযারে যায় এবং ঐ দুঃখ দূর করার জন্যে মাযারে গিয়ে পশু যবেহ করে, ব্যবস্যা-বাণিজ্যে একটু লাভ হলেই নিয়ত করে ফেলে, ওমুক মাযারে গিয়ে বাবার নামে একটি গরু অথবা ছাগল যবেহ করতে হবে। আর যদি তাদেরকে কুরআন ও হাদীসের মাধ্যমে ঐ যবেহ করাটা পাপ বলে প্রমাণ দেয়ার হয় তখন তারা বলে ফেলে বেশীর ভাগ মানুষই তো এ কাজ করে চলেছে, যদি সত্য পাপই হতো, তাহলে ওরসের সময় বাবার নামে পশু যবেহ করার হিড়িক কোন দিনই থাকতো না।

অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

যদি তুমি দুনিয়ার বেশীর ভাগ লোক যা করে তার অনুসরণ কর, তবে তারা

তোমাকে আল্লাহর রাস্তা থেকে বিভ্রান্ত করে দিবে। তারা শুধু অলীক কল্পনার অনুসরণ করে এবং সম্পূর্ণ অনুমানভিত্তিক কথাবার্তা বলে।"

(সূরা আন-আমঃ ১১৬ আয়াত)

অনেকের ধারণা যে, সাধারণ ক্ববরবাসী আমদের সম্পর্কে না জানলেও নবী ও রাসূলগণ আমাদের সব খবরই রাখেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার পবিত্র কুরআন থেকে এও প্রমাণিত হচ্ছে যে, রসূলগণও আমাদের সম্পর্কে কিছুই অবগত নন।

যারা মাযারে মৃত ক্ববরবাসীর কাছে শাফা'আত লাভের জন্য যায় এবং বলে থাকে আমরা পাপী ও পাপীর দু'আ আল্লাহ তা'আলা কবুল করেন না। তাই নেক ব্যক্তি আমাদের জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে সুপারিশ করে। তারা আরও বলে উকিল ছাড়া যেমন জজের কাছে পৌছা যায় না, তেমনই আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ পৌছাতে হলে উকিল হিসেবে সেই মৃত ব্যক্তির কাছে যেতে হবে।

তারা আরও বলে একটি ছাদের উপর সিঁড়ি ছাড়া যেমন উঠা যায় না, তেমনই সেই উঁচু আকাশের উপর আল্লাহ তা'আলার কাছে সিঁড়ি ব্যতিত পৌছা যায় না। সিঁড়ি বলতে বুঝাতে চাচ্ছে, সেই নেক ব্যক্তির মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার কাছে পৌছতে হবে। এই সমস্ত কথা মানুষ নিজের অজ্ঞানতা থেকেই বলে থাকে পবিত্র কুরআন বা হাদীসে যার কিছুই প্রমাণ নাই। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাহাবীগণ তাঁর ক্ববরে গিয়ে তাঁকে উকিল বানিয়ে আল্লাহ তা'আলার কাছে শাফা'আত করার জন্য বলেননি। যারা মাযার ভক্ত তারা এমনই বলে এবং মনে করে থাকে যে, তারাই সরল সত্য পথে আছে।

এদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا-

"তারাই সে লোক যাদের প্রচেষ্টা পার্থিব জীবনে পান্ড হয়; অথচ তারা এই ধারণাই পোষণ করে যাচ্ছে যে, তারা বেশ উত্তম কাজই করে যাচ্ছে।"

(সূরা কাহফঃ ১০৪ আয়াত)

যে সব লোক কুফর ও শিরক-বিদআত কিংবা অন্য কোন অবৈধ কার্যকলাপে লিপ্ত হয়, তার কারণ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই এমন হয়ে থাকে যে, শয়তান তাদের দুষ্কর্মকে সুন্দর, প্রশংসনীয় এবং কল্যাণকর হিসেবে প্রকাশ করে যার দরুণ তারা মন-মস্তিষ্কে ন্যায় ও সত্য এবং প্রকৃত হক কাজই করছে বলে মনে করে। তারা নিজেদের অন্যায়কেই ন্যায় এবং মন্দকে ভাল মনে করতে শুরু করে। এরা বলে জজ সাহেব আমাদের মত মানুষ। তিনি কিছুমাত্র গায়িবের খবর রাখেন না, তাই উকিল সাহেব বিস্তারিত ঘটনা জজ সাহেবের সামনে পেশ

করেন এবং জজ সাহেব সেটা শোনার পর চিন্তা ভাবনা করে বিচার করেন।

উকিল এ জন্যই ধরতে হয় যে, জজ সাহেবের কোন ঘটনা সম্পর্কে কিছুই জানা থাকে না। কিন্তু মহান আল্লাহ তা'আলা তিনি আমাদের সব খবরই রাখেন, এমন কি মানুষ যদি রাত্রির গভীর অন্ধকারেও কোন পাপ করে তবুও আল্লাহ তা'আলা দেখে থাকেন, মহান আল্লাহর নিকট কিছুই গোপন নয়, বরং সব কিছুই প্রকাশ। পাহাড়ের গোপন গুহায়, নির্জন জঙ্গলে, আকাশের যে কোন প্রান্তে, সমুদ্রের তলদেশে, পৃথিবীর যে কোন জায়গায়, যে কোন সময়ে, যে কোন ব্যক্তি বা শক্তি দ্বারা যে কোন কাজ হোক না কেন, দুনিয়ার কোন মানুষ সে খবর জানতে না পারলেও সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা তার সব কিছুরই সঠিক খবর রাখেন।

এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

أَوَلَيْسَ اللّٰهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِيْ صُدُوْرِ الْعٰلَمِيْنَ*

" আল্লাহ তা'আলার কাছে সমস্ত বিশ্ববাসীর অন্তরসমূহের কথা কি জানা নেই?" (সূরা আল-আনকাবূতঃ ১০ আয়াত)

রসূলুল্লাহ (সঃ) অনেক বিপদেরই সম্মুখীন হয়েছেন। অনেক যুদ্ধে শত্রুদের মুকাবিলা করতে হয়েছে। কিন্তু কখনই এমন বলেননি যে, হে আল্লাহ! আদম (আঃ) এর অসীলায় অথবা অন্য কোন নবীর অসীলায় আমাদের জয়যুক্ত করে দিন। বদরের যুদ্ধেও মুসলিমগণ সংখ্যায় অল্প ছিলেন। সেই সময়ও তারা অন্য কারো কাছে সাহায্য চাননি, বরং সেই মহান আল্লাহ তা'আলার কাছেই সব সময় সাহায্য চেয়েছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ*

আমার উপর দায়িত্ব হচ্ছে মু'মিনদের সাহায্য করা।" (সূরাঃ আর-রূমঃ ৪৭ আয়াত)

তাছাড়া যেখানে আল্লাহ তা'আলা নিজে বলেছেন, আমার দায়িত্ব হচ্ছে মু'মিনদের সাহায্য করা, সেখানে অন্যের কাছে সাহায্য চাওয়ার প্রশ্নই উঠে না।

আল্লাহ বলেনঃ

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَنْ يَّخْلُقُوْا ذُبَابًا وَّلَوِ اجْتَمَعُوْا لَهٗ وَاِنْ يَّسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْـًٔا لَّا يَسْتَنْقِذُوْهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوْبُ-

হে মানুষেরা একটা উদাহরণ পেশ করা হচ্ছে, খুব ভাল করে শুন! তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে যাদেরকে ডাকছ কখনই তারা একটা মাছিকে পর্যন্ত সৃষ্টি করতে পারবে না, যদিও তারা সকলেই একত্রিত হয় এর জন্য। আর যদি কোন

মাছি কোন কিছু চুরিও করে তারা সকলে মিলে তার থেকে সেটা উদ্ধার করতে পারবে না। যে চায় এবং যার কাছে চায় উভয়কেই দুর্বল করা হয়েছে।"

(সূরা হজ্জঃ ৭৩ আয়াত)

শয়তান মানুষকে ধোঁকা দিয়ে কখনও তাদের দ্বারা এমন কাজ করায় যা থেকে মানুষ মনে করে আমরা খুব নেকীর কাজই করে যাচ্ছি এবং এতে আল্লাহ তা'আলা আমাদের উপর খুবই বেশী খুশী হচ্ছেন। যেমন অনেকে মাযারে গিয়ে থাকে তার বিপদ দূর করার জন্যে, অথবা মালে বরকত লাভের জন্য। কিন্তু সেই মাযারে সমস্ত মিথ্যাচারী ও বিভ্রান্ত লোকেরই আড্ডা। এদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেনঃ

وَاَمَّا اِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِيْنَ الضَّآلِّيْنَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيْمٍ * وَّتَصْلِيَةُ جَحِيْمٍ* اِنَّ هٰذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِيْنِ*

"যে কেউ মিথ্যাচারী ও বিভ্রান্ত দলের শামিল হবে, তার সমাদর হবে ফুটন্ত পানি দিয়ে। আর জাহান্নামেই তাকে পৌছতে হবে। একথা অবশ্যই সত্য ও সুনিশ্চিত।"(সূরা আল-ওয়াকিয়াঃ ৯৩-৯৫)

কাজেই জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান লোকদের উচিত হবে এই আযাবের সম্মুখীন হবার পূর্বেই যাবতীয় শির্ক, গুনাহগুলোর জন্য সেই দয়াময় মহান আল্লাহ তা'আলার দরবারে অন্তর থেকে তওবা করা।

যে সব অসিলা (মাধ্যম) খোঁজা নিষেধও দীনের মধ্যে তার কোন মূল্য নেই

১। নবী (সঃ)-এর সম্মানের অসিলা খোঁজা ঃ যেমন বলা ঃ হে আমার প্রতিপালক রসূল (সঃ)-এর অসিলায় আমাকে রোগমুক্ত কর। এটা বিদআ'ত। কারণ সাহাবীরা কেউ এটা করেন নাই। আর যে হাদীসে বলা হয় "আমাকে অসিলা করে দু'আ কর" সেটার মূলে হাদীসই নয়। যা **শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া (রহঃ) বলেছেন**। আর এই বিদআতী অসিলা মানুষকে শির্কে পর্যন্ত পৌছিয়ে দেয়, যখন এই ধারণা করা হয় যে, আল্লাহ পাক কোন মাধ্যম ছাড়া করতে পারেন না। যেমন আমীর ও বিচারকগণ। এতে আল্লাহকে সৃষ্টির সাথে তুলনা করা হয়। **আলাই তানবীরে'র মধ্যে তাতারখানীয়ার** ঐ বরাতে উল্লেখ করেছেন যে, ইমাম আবূ হানিফা (রহঃ) বলেনঃ আমি আল্লাহ ছাড়া অন্যের অসিলা করে আল্লাহর কাছে চাওয়াকে অপছন্দ করি।

২। নবী (সঃ)-এর কাছে দু'আ করা তাঁর মৃত্যুর পর যেমন বলা, হে রসূল (সঃ) আমার জন্যে দু'আ করুন এটা জায়িয নয়। কারণ আমার আহ্বান সম্পর্কে রাসূল (সঃ) অবগত নন। সাহাবীরা কেউ এরূপ করেননি। তাছাড়া আল্লাহর নবী (সঃ) বলেছেনঃ "যখন মানুষ মারা যায় তখন তার আমল নামা

তিনটি ক্ষেত্র ছাড়া বন্ধ হয়ে যায়ঃ সদকায়ে জারিয়া করে থাকলে, এবং ঐ উপকারী ইল্‌ম যা সে শিখিয়েছে এবং নেক সন্তান সে পিতা-মাতার জন্য দু'আ করে"। **(মুসলিম)**

এই সমস্ত আমলগুলোর সওয়াব সে ক্ববরেও পেতে থাকে।

৩। মৃতদের মধ্যে অসিলা খোঁজা ঃ তাদের কাছে কোন প্রয়োজনীয় জিনিস চাওয়া, সাহায্য চাওয়া যেটা আজ দেখা যাচ্ছে। একে মানুষ অসিলা মনে করে, মূলে কিন্তু তা নয়। কারণ অসিলার অর্থ হল আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়া; যা ঈমানের দ্বারা এবং নেক কাজের দ্বারা সম্ভব। অন্যদিকে মৃতদের কাছে দু'আ করা আল্লাহ হতে মুখ ফিরানোর নামান্তর। এটা বড় শিরকের অন্তভূক্ত। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَالَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَاِنْ فَعَلْتَ فَاِنَّكَ اِذًا مِّنَ الظّٰلِمِيْنَ*

" আল্লাহ ছাড়া এমন অন্যের কাছে দু'আ করো না যারা না পারে তোমার উপকার করতে, আর না পারে তোমার ক্ষতি করতে। যদি তা কর তবে নিশ্চয়ই তুমি জালিমদের অন্তর্ভূক্ত হবে।" **(সূরাঃ ইউনুসঃ ১০৬ আয়াত)**

৪। শরীয়ত সম্মত অসীলা ঃ কুরআন সুন্না হতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে শরীয়ত সম্মত অসীলাকে তিনভাগে সীমাবদ্ধ পাওয়া যায়- (১) আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর অসীলা। (২) সৎ আমলের অসীলা। (৩) সৎ ব্যক্তির দু'আর অসীলা।

(অসীলার মর্ম ও বিধান-ডঃ সালিহ বিন সা'দ আস্-সুহাইমী ৯ পৃঃ)

আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে মানত হারাম

প্রায়ই দেখা যায় যে, মাযার ভক্তরা বিভিন্ন মাযার গুলোতে মোরগ, খাসী, গরু, উট, মুরগী, বকরী প্রভৃতি জন্তু মানত করে এবং এগুলো সেখানে যবেহ করে ও মিসকিন- মুসাফিরদের মধ্যে তা বিলি করে। তাই আমাদের জানা দরকার যে, ইসলামে মানতের গুরুত্ব কি এবং মাযারে তা যবেহ করার হুকুম ইসলামে আছে কি না?

বিখ্যাত সাহাবী আবূ হুরাইরা ও ইবনু উমার (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, তোমরা মানত করো না। কারণ, মানত ভাগ্য থেকে কোন জিনিসকেই বেপরোয়া করতে পারে না। এমতাবস্থায় তার (মানত) দ্বারা কৃপণ ব্যক্তি থেকে কেবলমাত্র কিছু বের করে নেয়া হয়। **(বুখারী, হাঃ ৬২২৬, ৬২২৭)**

তাই মানত করা উচিতই নয়। তবুও কেউ যদি মানত করে ফেলে তাহলে তার জন্য আ'ইশা (রাঃ)-এর বর্ণনায় রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য করার জন্য মানত করবে সে যেন তাঁর (আল্লাহর) অনুগত্য করে। আর যে ব্যক্তি তাঁর অবাধ্য হবার মানত করে সে যেন তাঁর অবাধ্যতা না করে।

(বুখারী হাঃ ৬২২৯)

আল কুরআনের সূরা হাজ্জের ২৯ নং আয়াতে আল্লাহ বলেনঃ তাদের উচিত তাদের মানত পূরণ করা। "হানাফী ফিকহে" আছে মানত করা আল্লাহর ইবাদত। **(দুররে মুখতার ২য় খণ্ড, ১৩৯ পৃঃ)**

তাই আল্লাহ ছাড়া কোন পীরের খানকায়, মৃত অলীর মাযারে, কোন দরবেশের দরগায় কোন কিছু মানত করা উক্ত ফিকহে- হানাফীর ফাতওয়া অনুসারেও শির্ক হয়। বিভিন্ন মাযারে হালুয়া ও মিষ্টি, বাতি ও চাদর প্রভৃতি দেয়ার মানত করা শিরকের মধ্যে গণ্য হবে। হানাফী ফিক্‌হে দুররে মুখতারে আছে যে, তুমি জেনে রাখ যে, অধিকাংশ জনগণের তরফ থেকে মৃত ব্যক্তিদের জন্য যে মানত করা হয় এবং মাননীয় অলীদের ক্ববরে সে সব টাকা পয়সা এবং মোমবাতি ও তেল প্রভৃতি নেওয়া হয়ে থাকে তাদের নৈকট্যলাভের উদ্দেশ্যে সে সব কাজ সবারই মতে বাতিল ও হারাম। **(দুররে মুখতার ১ম খণ্ড, ১৫৫ পৃঃ)**

মক্কা দারুল হাদীসের শিক্ষক মুহাম্মাদ বিন জামীল বলেন, ঐ সমস্ত নযর নেয়ায বা মৃতদের জন্য পেশ করা হয় যা বড় শিরকের অন্তর্ভুক্ত। যে নযর দেয় এবং নেয়া উভয়ই এই পাপে শরীক হবে। **(বাংলা অনুবাদকৃত মুক্তি প্রাপ্তদলের পাথেয় ৫৪ পৃঃ)**

বিশিষ্ট সাহাবী সালমান (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি একটি মাছির ঘটনায় জান্নাতে প্রবেশ করে এবং আর এক ব্যক্তি একটি মাছির ঘটনায় জাহান্নামে প্রবেশ করে। সাহাবীরা বলেন, তা কিভাবে? রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, তোমাদের আগে যারা ছিল তাদের মধ্যে দু'জন লোক এমন কিছু লোকদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল যাদের কাছে একটি ঠাকুর ছিল। তাদের পাশ দিয়ে যে কেউ অতিক্রম করছিল সেই তাদের ঠাকুরের জন্য মানত পেশ করছিল। অতএব, তারা একজন লোককে বললো, আপনি কোন জিনিস (এই ঠাকুরের নামে) মানত করুন। লোকটি বলো, আমার কাছে কোন জিনিসই নেই। তারা বললো, তুমি একটি মাছি মানত কর। তাই সে একটি মাছি কুরবানী দিল এবং সেখান থেকে চলে গেল। অতঃপর ঐ লোক জাহান্নামীদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেল। এবার তারা অন্য লোকটিকে বললো, আপনিও কোন জিনিস কুরবানী দিন। সে বললো, আমি আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কারোর জন্য মানত করি না। তাই তারা তাকে খুন করে ফেললো। ফলে সে জান্নাতে প্রবেশ করলো। **(হিলয়্যাতুল আউলিয়া ১ম খণ্ড, ২০৩ পৃঃ)**

উক্ত হাদীসটি প্রমাণ করে যে, মাছির মতো একটি তুচ্ছ জিনিসও আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য মানত করা শিরক। যার পরিণাম জাহান্নাম।

একথা বলা হয় যে, যবহের সময় আল্লাহর নাম নিলে যবেহকৃত জন্তুটি হালাল ও পাক হয়ে যায় যদিও জনগণের নিয়ত খারাপ থাকে তাদের এরূপ

ধারণা ভুল ধারণা। কারণ, আল্লাহ ছাড়া অন্যের সম্মানার্থে যবেহকৃত জানোয়ার মৃতপশু হয়ে যায়। যদিও তাতে কেবল মাত্র আল্লাহরই নাম নেয়া হয়।

(দুররে মুখথার উর্দু তরজমা গ-ইয়া তুল আওতার-র ৪র্থ খণ্ড, ১৭৯ পৃঃ)

আল্লামা শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলভী (রহঃ) বলেন, যে জন্তুগুলো আল্লাহ ছাড়া অন্যের (মানতের) উদ্দেশ্য প্রসিদ্ধি লাভ করেছে তা শুয়োরের চেয়েও জঘন্য এবং মৃত জন্তু। **(মযা-হিরে হাক্ব ৩য় খণ্ড, ২৮৯ পৃ, মুরতাদের বিবরণ)**

ক্ববর পাকা করা যাবে না, ভেঙ্গে ফেলতে হবে

আবূ মুহাম্মাদ হুযালী থেকে বর্ণিত, আলী (রাঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ) এক জানাযায় ছিলেন। অতঃপর তিনি বলেন, তোমাদের মধ্যে কে মদীনায় যেতে পারে? অতঃপর সে তথায় কোন মূর্তি পেলে তা না ভেঙ্গে ছাড়বে না এবং কোন ক্ববর পেলে তা জমিন বরাবর না করে ছাড়বে না। আর কোন ছবি পেলে সেটাকে সে না মিটিয়ে ছাড়বে না। তখন একজন লোক বললো, হে আল্লাহর রসূল! আমি যাব, অতঃপর তিনি চলে গেলেন। কিন্তু মদীনাবাসীদের ভয় পেয়ে তিনি ফিরে এলেন। তখন আলী (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি যাব, অতঃপর তিনি গেলেন। তারপর তিনি ফিরে এসে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি সেখানে এমন কোনও মূর্তী না ভেঙ্গে এবং কোন ক্ববর জমিনের সমান না করে ছাড়িনি। আর কোন ছবিও না মিটিয়ে ছাড়িনি। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, যে ব্যক্তি এই জিনিসগুলো পুনরায় করবে সে মুহাম্মাদ (সঃ)-এর উপর যা নাযিল করা হয়েছে তা অমান্য করবে। **(মুসনাদে আহমাদ ১ম খণ্ড, ১৪০ ও ২২৩ পৃঃ)**

ইমাম শাফিঈ (মৃত ২০৪ হিঃ) বলেন, তাঁর যুগে ইসলামী শাসকগণ পাকা ক্ববরগুলোকে ভেঙে চুমার করে দিতেন। তখনকার ফিক্হবিদ আলিমগণ তাতে কোন রকম আপত্তি করতেন না। **(কিতাবুল উম্ম ১ম খণ্ড, ২৪৬)**

বিখ্যাত হানাফী মুহাদ্দিস আল্লামা আলাউদ্দিন (মৃত ৭৪৫ হিঃ) বলেন, পাকা ক্ববরগুলোকে ভেঙ্গে অন্যান্য সাধারণ ক্ববরে মতো করে দিতে হবে।

(আলজাওহারুন নক্বী আলাল বাইহাকী ৪র্থ খণ্ড, ৩য় পৃঃ)

বিশিষ্ট সাহাবী ইমরান ইবনু হুসাইন অসিয়ত করেন যে, লোকেরা যেন তাঁর ক্ববরটাকে চার আঙ্গুল কিংবা এরূপ উঁচু করে। **(শেষোক্ত-৩৩৫ পৃঃ)**

নবী (সঃ) একজনকে মাটি দিতে ক্ববরে হাজির হয়ে সাহাবায়ি কিরামকে বলেন, তোমরা তোমাদের সাথীর ক্ববরে বেশী মাটি দিওনা।

(মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক ৩য় খণ্ড, ৫০৫ পৃঃ)।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) মুসলিমদের ক্ববরগুলোতে ভিত গাড়াতে কিংবা এতে সিমেন্ট লাগাতে অথবা এতে চাষ করতে মানা করেছেন। কারণ, তোমাদের উত্তম ক্ববর সেটা, যেটা বুঝাই যায় না। **(ঐ ৫০৬ পৃঃ)**

সাহাবী জাবির থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (সঃ) নিষেধ করেছেন ক্ববরে সিমেন্ট লাগাতে ও তাতে বুনিয়াদ গড়তে (কিংবা তাতে বাড়তি মাটি ঢালতে) অথবা তাতে কিছু লিখতে। **(মুসলিম ১ম খণ্ড, ৩১২ পৃঃ, আবূ দাউদ ২য় খণ্ড, ১০৪ পৃঃ)**

আবূ মারসাদ গানাভী বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, তোমরা ক্ববরের দিকে মুখ করে সলাত পড় না এবং ওর উপরে বসবেও না- **(মসলিম, মিশকাত ১৪৮ পৃঃ)** বিখ্যাত সাহাবী আনাস (রাঃ) বলেন, নবী (সঃ) বিভিন্ন ক্ববরের মাঝে সলাত পড়তে নিষেধ করেছেন।

(মুসনাদ বায্যার, মাজমাউয যাওয়া- য়িদ ২য় খণ্ড, ১৭ পৃঃ)

আব্দুল্লাহ উবনু শারাহ বীল ইবনু হাসানাহ বলেন, আমি তৃতীয় খলীফা উসমান গনী (রাঃ)-কে দেখেছি যে, তিনি ক্ববরগুলোকে সমান করার নির্দেশ দিচ্ছেন তাঁকে একবার বলা হল যে, এটা আপনারই কন্যা উম্মে আম্রের ক্ববর তবুও তিনি বললেন, ওটাকেও সমান করে দাও। তাই ওটাকেও সমান করে দেয়া হয়। **(মুসান্নাফ ইবনু আবী শাইবাহ ৩য় খণ্ড, ৩৪১ পৃঃ)**

উপরে বর্ণিত প্রথম হাদীসটির ব্যাখ্যায় **বিখ্যাত হানাফী মুহাদ্দিস আল্লামা মুল্লা আলী ক্বা-রী বলেন,** ক্ববরের উপরে যে বিল্ডিং তৈরী হয়েছে সেটাকে ভেঙে জমিন বরাবর করার হুকুম দেয়া হয়েছে। সেই উচ্চতাকে নয়, যেটা ক্বরের চিহ্ন ও তার হিফাযতের কারণ হয়ে থাকে। **আল্ আযহা-রে লেখা আছে,** আলিমগণ বলেন, ক্ববরকে এক বিঘত, দুবিঘত উঁচু করা মুস্তাহাব বা পছন্দনীয় কাজ। তার চেয়েও উঁচু করা মাকরূহ তথা আপত্তিকর কাজ বরং ওর চেয়ে উঁচু হলে সেটাকে ভেঙে দেয়াই মুস্তাহাব। কতটা ভাঙা হবে তাতে অবশ্য মতভেদ আছে। কিছু আলিম বলেন যে, লোকদেরকে সতর্ক করা এবং শিক্ষা দেবার জন্য শরীয়তী সীমার চেয়েও উঁচু ক্ববরগুলোকে জমিন সমান করে দেয়া উচিত। এই মতটিরই হাদীস শরীফের শব্দ- সাউঅইতাহূ-তুমি তাকে জমিনের সমান করে দেবে-এর অধিক নিকটবর্তী **(মিরআ-তুল মাফা-তীহ ২য় খণ্ড, ৩৭ পৃঃ)**

খাজাবাবার ডেগ

আরবী রজব মাসে সারা দেশে বিশেষ করে ঢাকাসহ বিভিন্ন শহরে যেখানে সেখানে খাজা বাবার নামে ডেগ বসানো হয়। সন্ধ্যার পর শুরু হয় এগুলোতে গানের আসর। মারিফতি গানের নামে শির্কী গানসহ রকমারী চটুল গান বাজিয়ে খাজা বাবার নামে পয়সা কালেকশন করা হয়। এ দেশের একশ্রেণী সাধারণ মানুষে ধর্মীয় অনুভূতিও এমন যে, ঘুমের ব্যাঘাত হলেও ভয়ে কিছু বলে না। তারা মনে করে এটা ধর্মীয় ব্যাপার। মাস্তানরা যেমন ছোরা দেখিয়ে চাঁদা চায়, হাইজ্যাকাররা সুযোগ বুঝে যেমন হাইজ্যাক করে, তেমনই অনেক জায়গায় ধর্মের নামে গাড়ী থামিয়ে বিভিন্নভাবে বাধ্যতামূলক চাঁদা আদায় করা হয়।

রাস্তার পাশে লাল সালু ডেগ বসিয়ে যারা টাকা কলেকশন করে তারা ঐ টাকা কত আজেবাজে কাজে খরচ করে তা সবাই জানে। অনেক সময় গাড়ির পথ বন্ধ করে দাঁড়ায়, আর বলে চাঁদা দিয়ে যাও নয়তো খাজার অভিশাপ লাগবে ইত্যাদি। এদের আকুতি মিনতির কাছে অনেক মানুষই পরাজিত হয়ে শিরকী কাজে টাকা দিয়ে দেয়; কিন্তু চিন্তা করে না কিসে এবং কেন দিলাম। এই মৃত্যুর ব্যক্তিরই বা কি উপকার হবে। খাজা বাবার নামকে পুঁজি করে যারা লাল সালু ডেগ বসায় তাদের অধিকাংশই দীন ধর্মের ধার ধারে না। এদের অনেকেই জোর করে চাঁদা তুলে এই টাকায় নিজের পেট ভরে। এমনকি গাঁজা, চোরস রকমারী নেশায় এসব টাকা উড়ায়। অথচ রসূল (সঃ) বলেছেন, "তোমরা মানত করো না। কারণ মানত ভাগ্য থেকে কোন জিনিস ফিরাতে পারে না। এমতাবস্তায় মানত দ্বারা কৃপণ লোক হতে শুধু মাত্র কিছু বের করে নেয়া হয়।" (বুখারী- হাঃ ৬২২৬)

এছাড়া হানাফী ফিকাহ দুররে মুখতারে লিখা আছে, তুমি জেনে রাখ যে, অধিকাংশ মানুষের কাছ থেকে মৃত ব্যক্তিদের জন্য যে মানত করা হয় এবং মাননীয় অলীদের ক্ববরে যে সব টাকা পয়সা এবং মোমবাতি ও তেল প্রভৃতি দেয়া হয়ে থাকে তাদের নেকট্য লাভের উদ্দেশ্যে সে সব কাজ সবারই মতে বাতিল ও হারাম। (দুররে মুখতার ১ম খণ্ড ১১৫ পৃষ্ঠা)। তাই এসব অবৈধ কাজে টাকা পয়সা দেয়া বা কোনরূপ সহযোগিতা করা খুবই অন্যায় আর এগুলো উচ্ছেদের লক্ষ্যে জোরালো পদক্ষেপ নেয়া দরকার, যাতে মানুষের ঈমান বিনষ্টের কারণগুলো সমাজ থেকে নির্মূল হয়ে যায়।

তিনটি স্থান ব্যতীত নেকীর উদ্দেশ্যে সফর নাজায়িয

সাধারণ মুসলিমদেরকে দেখা যায় নেকী বা কোন উদ্দেশ্য হাসিল অথবা পীর, ফকীর, অলী বুযুর্গুদের ভক্তি ও শ্রদ্ধা জানানোর জন্য তাদের ক্ববর যিয়ারত করতে যান। যেমন ঃ আজমীরের খাজা মাঈনুদ্দীন চিশতী, বাগদাদের আব্দুল কাদির জিলানী, সিলেটের শাহ্জালাল ও শাহপরান, খুলনার খানজাহান আলী চট্টগ্রামের বায়েজিদ বোস্তামী, ঢাকার হাইকোর্ট মাযার, গোলাপ শাহ্ মাযার ইত্যাদিতে যান। অথচ এই যিয়ারত বা সফর করা ইসলামী শরীয়তে নিষিদ্ধ। কেননা হাদীস শরীফে এসেছে- "তিনটি মাসজিদ ছাড়া কোন দিকে ভ্রমণ কর না, মাসজিদুল হারাম, আমার মাসজিদ অর্থাৎ মদীনার নবী (সঃ)-এর মাসজিদ এবং মাসজিদুল আকসা। (মুসলিম, হাঃ৩২৪৭)

যখন আমরা মদিনা শরীফ যাওয়ার নিয়ত করি তখন যেন বলিঃ আমরা মাসজিদে নববীতে যাচ্ছি যিয়ারতের জন্য এবং নবী (সঃ)-এর উপর সালাম দেয়ার জন্য। তাই তিনটি মাসজিদ ব্যতীত নেকীর উদ্দেশ্য অন্য কোন মাসজিদ, মাযার বা স্থানে যাওয়া যাবে না, শরীয়ত তা নিষেধ করছে।

ক্ববর পূজার সমর্থনে জাল হাদীস

আল্লামা শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (রহঃ) বলেনঃ ক্ববর পূজারীদের পথভ্রষ্ট হবার একটি কারণ এই যে, ঠাকুর তথা ক্ববর পূজারীগণ নানারকম জাল হাদীস তৈরী করেছেন। সেই সব জাল হাদীস হচ্ছেঃ

১। তোমরা যখন বিভিন্ন ব্যাপারে হতভম্ব হয়ে যাবে তখন তোমরা ক্ববরবাসীদের দ্বারা সাহায্য প্রার্থনা করবে।

২। বিভিন্ন ব্যাপার যখন তোমাদেরকে অপারগ করে দেবে তখন তোমরা ক্ববরবাসীদের আকড়ে ধরবে।

৩। তোমাদের কেউ যদি কোন পাথরে সুধারণা পোষণ করে তাহলে তা তাকে অবশ্যই ফায়দা দেবে। (বালাগুল মুবীন, উর্দু তরজমা ৯১-৯২ পৃঃ)

আল্লামা শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (রহঃ) আরো বলেন,

এগুলো ছাড়াও আরো বহু হাদীস মাযার পূজারীরা মনগড়া তৈরী করেছে। অথচ ঐসব বেওকুফরা এটা বোঝে না যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর রসূল (সঃ)-কে এজন্য পাঠিয়েছিলেন যাতে তিনি পাথর ও গাছ দ্বারা লাভ- লোকসান পাবার ধারণা পোষণকারীকে হত্যা করেন। তাই নবী করীম (সঃ) সব রকম সম্ভাব্য উপায়ে নিজ উম্মাতকে ক্ববর পূজা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করেছেন। (ঐ ৯২ পৃঃ) (সূত্রঃ পাকা মাযার ও বিভিন্ন পাপাচার- ৫১, ৫২ পৃঃ)

ক্ববরে বা মৃত ব্যক্তির নামে কুরআন পড়া যাবে না

১। **হানীফা মুহাদ্দিস আল্লামা আইনী বলেন,** কুরআন পড়ে মজুরী গ্রহণকারী ও তা দানকারী দু'জনেই পাপী। ফলকথা, আমাদের যুগে কুরআনের পারাগুলো মজুরি নিয়ে পড়ার যে প্রচলন ছড়িয়ে পড়েছে তা বৈধ নয়।

(বিনা-য়্যাহ শারহে হিদায়াহ ৩য় খণ্ড, ৬৫৫পৃষ্ঠার বরাতে ব্রেলভিয়্যাত ২২৭ পৃঃ)

২। **আল্লামা ইবনু আ-বিদীন হানাফী বলেন,** ঐরূপ করা কোন মাযহাবেই বৈধ নয়। ওর কোন সাওয়াবও পাওয়া যায় না। (মাজমূআহ রাসায়িল ইবনু আ-বিদীন ১ম খণ্ড, ১৭৩-১৭৪ পৃষ্ঠার বরাতে ব্রেলভিয়্যাত ২২৮ পৃঃ)

৩। **আল্লামা আব্দুল হাই লাখনাভী (রহঃ)ঃ** বিভিন্ন ফকীহ্দের বহু বরাত দিয়ে প্রমাণ করেছেন, যেমন মজুরি নিয়ে কুরআন পড়া এবং তসবীহ (সুবহানাল্লা-হ) ও তাহলীল (লা-ইলা ইল্লাল্লা-হ) পড়া বাতিল কাজ। এর সাওয়াব মৃতব্যক্তি পায় না এবং পাঠকারীও পায় না।

(মুজমুআহ ফাতা- ওয়অমাওলানা আব্দুল হাই ২য় খণ্ড, ৮৭ পৃঃ)

৪। **হানাফী ফিক্হের প্রসিদ্ধ গন্থে আছে-** মৃতব্যক্তিদের জন্য কুরআন পাঠ করার দাওয়াত গ্রহণ করা মাকরূহ এবং কুরআন কিংবা সূরা আন-আম ও সূরা ইখলাস ইত্যাদি পাঠ করার জন্য সৎলোক ও ক্বারীদেরকে সমবেত করা নিষিদ্ধ।

(ফাতাওয়ায়ে বাব্‌যাযিয়্যাহ্ ৪র্থ খণ্ড, মিসর ছাপা, কিতাবুল হযর অলইবা-হা ফাতাওয়া শা-মিয়াহ ১ম খণ্ড, ৬০৪ পৃঃ) (সূত্রঃ পাকা মাযার ও বিভিন্ন পাপাচার- ৫৯-৬১ পৃঃ)

ওরসের নামে জঘন্য কর্মকাণ্ড

ওরস শব্দের অর্থ বাসর রাতের মিলন **(আল কামূস ২য় খণ্ড, ১২৩ পৃঃ)**। অলীমার খানা ও খুশী প্রভৃতি। **(মিসবাহুল লগা-ত ৫২০ পৃঃ)**

কিছু লোকের পরিভাষায় ওরস বলা হয়, কোন বুযুর্গ ব্যক্তির মাযারে তাঁর মৃত্যু দিবস পালনের নামে ধর্মীয় জলসার আয়োজন করা এবং তাঁর ভক্ত জনগণের ভিড় অর্থাৎ একটি মেলার রূপ ধারণ করা। আল-কুরআনের কোথাও ওরস শব্দটি ব্যবহৃত হয়নি। কিন্তু হাদীসে এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে বাসর রাতের মিলন অর্থে। যেমন বিখ্যাত সাহাবী আবূ হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনায় রসূলুল্লাহ (সঃ) ক্ববরের বর্ণনা দিতে গিয়ে মালাইকার (ফিরিশতার) মুখ দিয়ে নেক্‌কার লোকদেরকে বলেনঃ নাম কানাওমাতিল আরুস- অর্থাৎ তুমি বাসর রাতের বর- কনের ঘুমের মত ঘুমাও। **(তিরমিযী, মিশকাত ২৫ পৃঃ)**

মহানবী (সঃ)-এর মৃত্যুর সময় তাঁর সাহাবায়ি কিরাম ছিলেন এক লাখ চৌদ্দ হাজার। **(উলূমুল হাদীস ২৬৮ পৃঃ)**।

উক্ত সমস্ত মাননীয় সাহাবীগণের মৃত্যুর নাম করে কোন রকমই ওরস পালন করা হয় না।

তাবি-তাবিঈদের পরবর্তী যুগে মুসলিমরা যখন ইসলামী শিক্ষা থেকে দূরে সরে যায় এবং মুশরিকদের সাথে মেলামেশার সুযোগ পায় তখন তাদের সাহচর্যে অজ্ঞ মুসলিমদের মধ্যে কিছু মুশরিকী ধ্যান ধারণা ও কার্যাবলী স্থান পায়। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন রকম শির্কের প্রচলন স্থান পায়। আমরা দেখতে পাই যে, আল্লাহর নবী (সঃ)-এর ক্ববরে, অন্যান্য সাহাবা (রাঃ)-এর ক্ববরস্থানে বা অন্য কোথাও, তাঁদের নামে ওরস বা ইসালে সাওয়াবের অনুষ্ঠানাদি হতে দেখা যায় না। এমনকি আল্লাহর রাসূল (সঃ)-এর জন্ম দিবস বা মৃত্যু দিবস উদযাপনের কোন নির্দেশ দেননি তাই সাহাবারা (রাঃ)ও তার কোন প্রচলন করে যাননি। অথচ একদল লোক পীর মোর্শেদর মাযারে এবং অন্যত্র ওরস এবং ইসালে সাওয়াব প্রভৃতির অনুষ্ঠানাদি করে যাচ্ছেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মৃত্যুবার্ষিকীর নামে কোন ওরস কখনই পালন করা হয় না। মহানবী (সঃ)-এর পরে মুসলিমদের কাছে অতিভক্তির পাত্র তাঁর চারজন মহামান্য খলীফা তাঁরা হলেন আবূ বাকর সিদ্দীক, উমার ফারূক, উসমান গণী ও আলী (রাঃ) এঁদের কারো নামেও ওরস পালন করা হয় না।

ওরস নামীয় মেলার অনুষ্ঠানাদিতে ভক্তরা অজস্র অর্থ ব্যায়ে বহু সংখ্যক গরু- ছাগল- মহিষ যবেহ করে ও শিরনী তৈরী করে। আর সব ভক্তরা মিলে সেগুলো তবারক হিসেবে খায় ও বিতরণ করে। কোন কোন ভক্ত অকাতরে অর্থব্যয় করে নিঃস্ব পর্যন্ত হয়ে যায় এই ধারণায় যে, সে বেশী অর্থব্যায় করে

পীর বাবার বেশী রেজামন্দি হাসিল রছেন। এসব অনুষ্ঠানে গান বাজনা করতে করতে বেগানা স্ত্রী পুরুষ এক সাথে জ্ঞান হারাও হয়ে যায়, আর এমন অজ্ঞান হলে স্ত্রী পুরুষের স্বাভাবিক জৈবিক সম্পর্ক হয়ে গেলেও তাকে তারা গুনাহর কাজ মনে করে না। নাঊযুবিল্লাহ।

নবী (সঃ)-এর ক্ববর পাকা করার কারণ

হিজরীয় ষষ্ঠ শতকে মিশরে এক তাহাজ্জুদ-গুযার দীনদার ও পারহেযগার বাদশাহ ছিলেন। আল্‌আ-দিল নূরুদ্দিন শহীদ (রহঃ) ৫৫৭ হিজরীতে একরাতে তাহাজ্জুদ পড়ার পর তিনি ঘুমিয়ে পড়েন। অতঃপর তিনি নবী (সঃ)-কে স্বপ্নে দেখেন। নবী (সঃ) তাঁকে লাল-হলুদ বর্ণের দু'জন লোকের প্রতি ইশারা করে বলছেন, এদের দু'জনের হাত থেকে আমাকে উদ্ধার কর। ফলে তাঁর ঘুম ভেঙ্গে যায় ঘাবড়ানো অবস্থায়। তারপর তিনি অযু করলেন এবং সলাত পড়ে শুয়ে পড়লেন। অতঃপর তিনি হুবহু ঐ স্বপ্নই দেখলেন এবং জেগে উঠলেন। আবার তিনি সলাত পড়লেন এবং শুয়ে গেলেন। তারপরও তৃতীয়বার তিনি ঐ স্বপ্নই দেখলেন এবং জেগে উঠলেন। এরপর আর তার ঘুম এলো না। তাঁর এক মন্ত্রীও ছিলেন নেক প্রকৃতির। যাঁর নাম ছিল জামালুদ্দীন মূসিলী। তাই তিনি মন্ত্রীকে ঐ রাতেই ডেকে পাঠালেন এবং তাঁকে সব বৃত্তান্ত শোনালেন। এবার মন্ত্রী বললেন, তাহলে আপনি এখনো বসে কেন? এখনই চলুন মদীনা শরীফ। আর আপনি যা দেখছেন তা গোপন রাখুন।

তারপর বাদশাহ বহু মালধনসহ তাঁর উযীর এবং বিশজন আরোহীকে সঙ্গে নিয়ে মদীনার দিকে পাড়ি দিলেন। অতঃপর ষোলদিনে তাঁরা মদীনায় পৌঁছে গেলেন। তারপর বাদশাহ গোসল করলেন এবং মাসজিদে নব্বীতে ঢুকে সলাত পড়লেন। অতঃপর মদীনাবাসীকে দান- খয়রাত দেবার কথা ঘোষণা করলেন। যাতে ঐ লোক দু'টিকে ধরা যায়। বাদশাহর ঘোষণা শুনে বহু লোক এল এবং বাদশাহর হাত থেকে দান ও হাদিয়া নিয়ে গেল। পরিশেষে যখন লোক আসা বন্ধ হল তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আর কেউ বাকী আছে কি? লোকেরা বলল, দু'জন পশ্চিমী ব্যক্তি ছাড়া কেউ বাকী নেই। কিন্তু ওরা তো কারো কাছ থেকে কিছু নেয় না এবং ওরা খুবই সাধু পুরুষ ও ধনী । যারা নিজেরাই দান করে বিভিন্ন প্রয়োজনে। কথাগুলো শুনে বাদশাহর মন খুশী হল। তাই তিনি বললেন, ঐ দু'জনকে আমার নিকট আন। ফলে ওদেরকে আনা হল। বাদশাহ দেখলেন যে, এরাই সেই দু'জন যাদের প্রতি নবী (সঃ) ইঙ্গিত করেছিলেন এই বলে যে, এদের দু'জন থেকে আমাকে উদ্ধার কর।

তাই বাদশাহ বললেন, তোমরা কোথাকার লোক? তারা বলল, পশ্চিম দেশের। আমরা হাজ্জ করতে এসেছিলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর পড়শী হতে পছন্দ করলাম। এবার বাদশাহ বললেন, আপনাদের থাকার জায়গা কোথায়? তারা বলল, নবীজীর ক্ববরের নিকটবর্তী সীমান্তে। অতঃপর বাদশাহ তাদেরকে আটক রেখে নিজে তাদের থাকার জায়গায় হাজির হলেন। সেখানে

(ফাতাওয়ায়ে বাব্‌যাবিয়্যাহ্ ৪র্থ খণ্ড, মিসর ছাপা, কিতাবুল হযর অলইবা-হা ফাতাওয়া শা-মিয়াহ ১ম খণ্ড, ৬০৪ পৃঃ) (সূত্রঃ পাকা মাযার ও বিভিন্ন পাপাচার- ৫৯-৬১ পৃঃ)

ওরসের নামে জঘন্য কর্মকাণ্ড

ওরস শব্দের অর্থ বাসর রাতের মিলন (আল কামূস ২য় খণ্ড, ১২৩ পৃঃ)। অলীমার খানা ও খুশী প্রভৃতি। (মিসবাহুল লগা-ত ৫২০ পৃঃ)

কিছু লোকের পরিভাষায় ওরস বলা হয়, কোন বুযুর্গ ব্যক্তির মাযারে তাঁর মৃত্যু দিবস পালনের নামে ধর্মীয় জলসার আয়োজন করা এবং তাঁর ভক্ত জনগণের ভিড় অর্থাৎ একটি মেলার রূপ ধারণ করা। আল-কুরআনের কোথাও ওরস শব্দটি ব্যবহৃত হয়নি। কিন্তু হাদীসে এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে বাসর রাতের মিলন অর্থে। যেমন বিখ্যাত সাহাবী আবূ হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনায় রসূলুল্লাহ (সঃ) ক্ববরের বর্ণনা দিতে গিয়ে মালাইকার (ফিরিশতার) মুখ দিয়ে নেক্‌কার লোকদেরকে বলেনঃ নাম কানাওমাতিল আরুস- অর্থাৎ তুমি বাসর রাতের বর- কনের ঘুমের মত ঘুমাও। (তিরমিযী, মিশকাত ২৫ পৃঃ)

মহানবী (সঃ)-এর মৃত্যুর সময় তাঁর সাহাবায়ি কিরাম ছিলেন এক লাখ চৌদ্দ হাজার। (উলূমুল হাদীস ২৬৮ পৃঃ)।

উক্ত সমস্ত মাননীয় সাহাবীগণের মৃত্যুর নাম করে কোন রকমই ওরস পালন করা হয় না।

তাবি-তাবিঈদের পরবর্তী যুগে মুসলিমরা যখন ইসলামী শিক্ষা থেকে দূরে সরে যায় এবং মুশরিকদের সাথে মেলামেশার সুযোগ পায় তখন তাদের সাহচর্যে অজ্ঞ মুসলিমদের মধ্যে কিছু মুশরিকী ধ্যান ধারণা ও কার্যাবলী স্থান পায়। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন রকম শির্কের প্রচলন স্থান পায়। আমরা দেখতে পাই যে, আল্লাহর নবী (সঃ)-এর ক্ববরে, অন্যান্য সাহাবা (রাঃ)-এর ক্ববরস্থানে বা অন্য কোথাও, তাঁদের নামে ওরস বা ইসালে সাওয়াবের অনুষ্ঠানাদি হতে দেখা যায় না। এমনকি আল্লাহর রাসূল (সঃ)-এর জন্ম দিবস বা মৃত্যু দিবস উদযাপনের কোন নির্দেশ দেননি তাই সাহাবারা (রাঃ)ও তার কোন প্রচলন করে যাননি। অথচ একদল লোক পীর মোর্শেদর মাযারে এবং অন্যত্র ওরস এবং ইসালে সাওয়াব প্রভৃতির অনুষ্ঠানাদি করে যাচ্ছেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মৃত্যুবার্ষিকীর নামে কোন ওরস কখনই পালন করা হয় না। মহানবী (সঃ)-এর পরে মুসলিমদের কাছে অতিভক্তির পাত্র তাঁর চারজন মহামান্য খলীফা তাঁরা হলেন আবূ বাকর সিদ্দীক, উমার ফারূক, উসমান গণী ও আলী (রাঃ) এঁদের কারো নামেও ওরস পালন করা হয় না।

ওরস নামীয় মেলার অনুষ্ঠানাদিতে ভক্তরা অজস্র অর্থ ব্যায়ে বহু সংখ্যক গরু- ছাগল- মহিষ যবেহ করে ও শিরনী তৈরী করে। আর সব ভক্তরা মিলে সেগুলো তবারক হিসেবে খায় ও বিতরণ করে। কোন কোন ভক্ত অকাতরে অর্থব্যয় করে নিঃস্ব পর্যন্ত হয়ে যায় এই ধারণায় যে, সে বেশী অর্থব্যায় করে

পীর বাবার বেশী রেজামন্দি হাসিল রছেন। এসব অনুষ্ঠানে গান বাজনা করতে করতে বেগানা স্ত্রী পুরুষ এক সাথে জ্ঞান হারাও হয়ে যায়, আর এমন অজ্ঞান হলে স্ত্রী পুরুষের স্বাভাবিক জৈবিক সম্পর্ক হয়ে গেলেও তাকে তারা গুনাহর কাজ মনে করে না। নাঊযুবিল্লাহ।

নবী (সঃ)-এর ক্ববর পাকা করার কারণ

হিজরীয় ষষ্ঠ শতকে মিশরে এক তাহাজ্জুদ-গুযার দীনদার ও পারহেযগার বাদশাহ ছিলেন। আল্‌আ-দিল নূরুদ্দিন শহীদ (রহঃ) ৫৫৭ হিজরীতে একরাতে তাহাজ্জুদ পড়ার পর তিনি ঘুমিয়ে পড়েন। অতঃপর তিনি নবী (সঃ)-কে স্বপ্নে দেখেন। নবী (সঃ) তাঁকে লাল-হলুদ বর্ণের দু'জন লোকের প্রতি ইশারা করে বলছেন, এদের দু'জনের হাত থেকে আমাকে উদ্ধার কর। ফলে তাঁর ঘুম ভেঙ্গে যায় ঘাবড়ানো অবস্থায়। তারপর তিনি অযু করলেন এবং সলাত পড়ে শুয়ে পড়লেন। অতঃপর তিনি হুবহু ঐ স্বপ্নই দেখলেন এবং জেগে উঠলেন। আবার তিনি সলাত পড়লেন এবং শুয়ে গেলেন। তারপরও তৃতীয়বার তিনি ঐ স্বপ্নই দেখলেন এবং জেগে উঠলেন। এরপর আর তার ঘুম এলো না। তাঁর এক মন্ত্রীও ছিলেন নেক প্রকৃতির। যাঁর নাম ছিল জামালুদ্দীন মূসিলী। তাই তিনি মন্ত্রীকে ঐ রাতেই ডেকে পাঠালেন এবং তাঁকে সব বৃত্তান্ত শোনালেন। এবার মন্ত্রী বললেন, তাহলে আপনি এখনো বসে কেন? এখনই চলুন মদীনা শরীফ। আর আপনি যা দেখছেন তা গোপন রাখুন।

তারপর বাদশাহ বহু মালধনসহ তাঁর উযীর এবং বিশজন আরোহীকে সঙ্গে নিয়ে মদীনার দিকে পাড়ি দিলেন। অতঃপর ষোলদিনে তাঁরা মদীনায় পৌঁছে গেলেন। তারপর বাদশাহ গোসল করলেন এবং মাসজিদে নববীতে ঢুকে সলাত পড়লেন। অতঃপর মদীনাবাসীকে দান- খয়রাত দেবার কথা ঘোষণা করলেন। যাতে ঐ লোক দু'টিকে ধরা যায়। বাদশাহর ঘোষণা শুনে বহু লোক এল এবং বাদশাহর হাত থেকে দান ও হাদিয়া নিয়ে গেল। পরিশেষে যখন লোক আসা বন্ধ হল তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আর কেউ বাকী আছে কি? লোকেরা বলল, দু'জন পশ্চিমী ব্যক্তি ছাড়া কেউ বাকী নেই। কিন্তু ওরা তো কারো কাছ থেকে কিছু নেয় না এবং ওরা খুবই সাধু পুরুষ ও ধনী । যারা নিজেরাই দান করে বিভিন্ন প্রয়োজনে। কথাগুলো শুনে বাদশাহর মন খুশী হল। তাই তিনি বললেন, ঐ দু'জনকে আমার নিকট আন। ফলে ওদেরকে আনা হল। বাদশাহ দেখলেন যে, এরাই সেই দু'জন যাদের প্রতি নবী (সঃ) ইঙ্গিত করেছিলেন এই বলে যে, এদের দু'জন থেকে আমাকে উদ্ধার কর।

তাই বাদশাহ বললেন, তোমরা কোথাকার লোক? তারা বলল, পশ্চিম দেশের। আমরা হাজ্জ করতে এসেছিলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর পড়শী হতে পছন্দ করলাম। এবার বাদশাহ বললেন, আপনাদের থাকার জায়গা কোথায়? তারা বলল, নবীজীর ক্ববরের নিকটবর্তী সীমান্তে। অতঃপর বাদশাহ তাদেরকে আটক রেখে নিজে তাদের থাকার জায়গায় হাজির হলেন। সেখানে

তিনি অনেক মালধন ও সীলমোহর এবং হৃদয়-গালানো কিছু গ্রন্থ দেখতে পেলেন। এছাড়া আর কিছু দেখতে পেলেন না। তদুপরি মদীনার বাসিন্দারা তাদের দু'জনের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে বললেন, এঁরা দু'জন আজীবন রোযাদার এবং নবীজীর রওযার মধ্যে সলাতের খুবই পাবন্দ। আর এরা প্রত্যেক দিন সকালে নবী (সঃ)-এর এবং বাকীউল গরকদ (জান্নাতুল বাকীর) ক্বর যিয়ারত করেন এবং প্রত্যেক শনিবারে কুবার যিয়ারত করেন। এরা কোন প্রার্থনাকারীকে কখন ফিরায় না। এই বছর দুর্ভিক্ষের সময় এরা মদীনাবাসীদের অভাব মোচন করেছেন।

তারপর বাদশাহ তাদের ঘরটা অনুসন্ধান করতে লাগলেন এবং একটি চাটাই তুললেন। অতঃপর নবীজীর ক্বর মুবারকের দিকে ধাবিত একটি সুড়ঙ্গ দেখতে পেলেন। ফলে সমস্ত লোকই কেঁপে উঠল। তারপর বদশাহ বললেন, এখনো তোমরা তোমাদের সত্য কথাটা বলো। অতঃপর তাদেরকে খুব পিটানো হল। মারের চোটে তারা স্বীকার করতে বাধ্য হল যে, তারা আসলে খৃষ্টান। তারা নবী (সঃ)-এর লাশ সরাতে এসেছে। রাতে তারা মাটি খুঁড়তো এবং পশ্চিমবাসীদের মত তারা চামড়ার জুব্বা পড়তো। ঐ জুব্বার মধ্যে তারা মাটিগুলো নিয়ে বাকীউল গরকদ (জান্নাতুল বাকী) যিয়ারত করার ভান করে বিভিন্ন ক্বরে তা ছড়িয়ে দিত। অতঃপর তারা যখন নবীজীর হুজরার নিকটবর্তী পৌঁছে যায় তখন আকাশ গর্জন করে এবং বিদ্যুৎ চমকে ওঠে। আর একটা বিরাট কম্পন হয় যদ্দ্বারা মনে হয় যে, ঐ সব পাহাড়গুলো যেন উৎপাটিত হল। ঐদিন ভোরেই বাদশাহ মদীনায় পৌঁছেন এবং তাদেরকে ধরে ফেলেন। কোন উপায় না দেখে তারা খুবই কাঁদতে থাকে। অতঃপর বাদশাহর নির্দেশে তাদের মৃত্যুদণ্ড দেয়া হল। ঐ দু'জন ছিল স্পেনের বাসিন্দা।

তারপর বাদশাহ প্রচুর সিসা আনালেন এবং নবীজীর হুজরার চারিদিকে পাতালের পানি পর্যন্ত গভীর গর্ত খোঁড়ালেন। অতঃপর সিসাগুলো গলিয়ে ঐ গর্তগুলোতে ভরে দিলেন। ফলে নবী (সঃ)-এর হুজরার চতুর্দিকে সীসার দেওয়ালে পরিণত হল। **(অফাউল-অফা ১ম খণ্ড, ৪৬৬-৪৬৮ পৃষ্ঠা, আদ্দুর সানিয়্যাহ ফিল আজভিবাতিন নাজ্‌দিয়্যাহ ২য় খণ্ড, ৪০৯ পৃষ্ঠা)**

এভাবে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এবং পরিস্থিতির তাগিদে প্রিয়নবী (সঃ)-এর পুরো ক্বরটা নয় কেবল এর চতুপার্শ্বটা অগত্যায় পাকা করতে হয়। **(সূত্রঃ দ্বীনুল হক-২২ পৃঃ, পাকামাযার ও বিভিন্ন পাপাচার-১১৩-১১৭ পৃঃ)**

রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ক্বরে সবুজ গম্বুজ

আল্লামা সামহূদী বলেন, নবী (সঃ)-এর এর অফাতের পর থেকে প্রায় সাতশ বছর ধরে তাঁর ক্বরে কোন পাকা ইমারত ছিল না। তারপর ৬৭৮ হিজরীতে (মিশরের বাদশাহ) মানসূর ইবনু কাল্লাদুন স্ব-লিহী কামাল আহমাদ ইবনু বুরহান আব্দুল কাভীর পরামর্শে কাঠের একটি গম্বুজের মত তৈরী করেন এবং সেটাকে আ'য়িশা (রাঃ)-এর এর হুজরার ছাদের উপর লাগিয়ে দেন।

ওটাই- কুব্বায়ে যুর্রাক্ব বা সবুজ গম্বুজ নামে প্রসিদ্ধ হয়ে যায়। সে যুগের আলিমগণ কোন ভাবেই ঐ কাজ করা থেকে বাদশাহকে বাধা দিতে পারেননি। তবে তাঁরা ওটাকে খুবই জঘন্য কাজ ভাবেন। অতঃপর ঐ কাজের পরামর্শ দাতা পূর্বোক্ত কামাল আহমাদ যখন গদিচ্যুত হন তখন লোকেরা তার ঐ গদিচ্যুতিকে আল্লাহর তরফ থেকে তার উক্ত জঘন্য কাজের শাস্তি হিসেবে গণ্য করেন। তারপর আল মালিকুন না-সির হাসান মুহাম্মদ কাল্লাদূন এবং তাঁর পরে ৭৬৫ হিজরীতে [redacted] কার্য করেন। এভাবে বর্তমান নির্মাণ পর্যন্ত কাজ হয়।

(অফা- উল অফা, ৪৩৫, ৪৩৬)

তারপর নবীজীর ক্বরটাকে নয়নাভিরাম লোহার জাল দিয়ে ঘিরে দেয়া হয়েছে এবং সেখানে পুলিশও মোতায়েন করা হয়েছে। যাতে শরীয়ত বিরোধী কোন কাজই তারা সেখানে কাউকেই করতে না দেন। আল্লামা মুহাম্মাদ না-সিরুদ্দীন আলবা-নী (রহঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ক্বরে পুলিশ মোতায়েন করা এবং শরীয়ত বিরোধী কাজ হতে না দেয়ার জন্য বর্তমান সউদী সরকার কৃতজ্ঞতার অধিকারী। কিন্তু এতটা কাজই যথেষ্ট নয়, বরং ঐ সরকারের অপরিহার্য কর্তব্য হল রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মাসজিদকে ওর আগেকার অবস্থায় ফিরিয়ে আনা। অর্থাৎ মাসজিদে-নব্বী এবং ক্বরে -নব্বীর মাসজিদ থেকে আলাদা করে দেয়া। যাতে করে মাসজিদে -নব্বীকে প্রবেশকারীগণ ওর মধ্যে শরীয়ত- বিরোধী এমন কিছু দেখতে না পান যা নবী (সঃ)-এর অপছন্দ ছিল। তা হল এই যে, কোন মাসজিদের মধ্যে কোন ক্বর যেন না থাকে। এরূপ কার্য সম্পাদনকারীকে তিনি লানত ও অভিসম্পাত দিয়েছেন। সউদী হুকুমত যদি সত্যিকার ভাবে তাওহীদ তথা একত্ববাদ প্রতিষ্ঠার সংকল্প রাখেন তাহলে তাঁদের এই প্রস্তাব মোতাবেক কাজ করা একান্ত কর্তব্য। আমি আশা করি যে, আল্লাহ তা'আলা সউদী হুকুমত দ্বারা এই কাজটা করিয়ে নেবেন। সউদী হুকুমতের চেয়ে এই কাজের বেশী দায়িত্বশীল ও যোগ্য আর কে হতে পারে?

(কাবরুঁ পর মাসা-জিদ তা'মীর ৬৮ পৃষ্ঠা)

উপরোক্ত বর্ণনাগুলো প্রমাণ করে যে, অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর এর ক্বর সম্বলিত আ'য়িশ (রাঃ)-এর হুজরাটি চারদিক দিয়ে ঘিরে দেয়া হয়েছিল। যার ছাদটা ক্বরে-নববীর আগেই মওজুদ ছিল। তারপর এক বিদআ'তী বাদশাহর বিদআ'তী ধ্যানধারণার ভিত্তিতে ওর ছাদের উপরে গম্বুজ তৈরী করা হয়েছিল। যা স্বয়ং রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পূর্বে বর্ণিত হাদীস অনুসারে মনগড়া তথা ইসলামবিরোধী কাজ। **(সূত্রঃ পাকা মাযার ও পাপাচার- ১১৭-১১৯ পৃ)** ক্বর অগত্যায় পাকা করার দোহাই দিয়ে যে কোন ক্বরকে পাকা- মাযারে পরিণত করা যাবে না। যেমন বর্তমানে হচ্ছে। আল্লাহ আমাদের বুঝার তওফিক দিন- আমীন!

আহ্বান!

পীর ফকীরদের স্বরূপ উন্মোচন এবং ক্ববর পূজাসহ এই সব কর্মকাণ্ডের ভয়াবহ পরিণতি অবহিত হওয়ার পর যারা এখনও এই পথে রয়েছে, তাদের উচিত অতিসত্তর আল্লাহর নিকট তাওবাহ করে এ পথ তথা শিরকী কর্মকাণ্ড থেকে ফিরে এসে তাওহীদের উপর এবং রসূল (সঃ)-এর দেখানো পথ সুন্নাতের উপর সর্বাবস্থায় অটল থাকার অঙ্গীকার করে মহান গাফুরুর রহীম আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা। অন্যথায় দুনিয়া ও আখিরাতে কঠোর ও ভয়াবহ আযাব ও শাস্তি থেকে বাঁচার কোন পথই থাকবে না। তাই আসুন সকল [illegible] কমাত্র আল্লাহর উপরই নির্ভর করি। সকল অবস্থায় ও সব বিষয়েই [illegible] এবং কাছেই একমাত্র সাহায্য চাই এবং শুধুমাত্র তার সন্তুষ্টির পথেই চলি। আল্লাহ আমাদের সেই তাওফীক দিন। আল্লাহ আমাদের শির্‌ক থেকে মুক্ত করে দুনিয়া ও আখিরাতকে সুখময় করে তুলুন- আমীন॥

শির্ক থেকে বেঁচে থাকার দূ'আ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ اَنْ اُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا اَعْلَمُهُ، وَاَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا اَعْلَمُهُ*

অর্থঃ হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি জেনে শুনে তোমার সঙ্গে শরীক করা হতে পরিত্রাণ চাই এবং অজ্ঞাত অবস্থায় যা করে ফেলি তা হতে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

(সহীহুল জামে' সাগীর ৩-২৩৩)

গ্রন্থপঞ্জী

১। তাফসীর ইবনু কাসির –অনুবাদ ডঃ মুজিবুর রহমান ২। তাফসীর কুরআনুল কারীম- আকরাম খাঁ ৩। মারেফুল কুরআন (সংক্ষিপ্ত) মওঃ মহিউদ্দীন খান ৪। তাফহীমুল কুরআন- আবুল আলা' মওদূদী, ৫। তাফসীর ফী জিলালিল কুরআন- সাইয়েদ কুতুব ৬। বুখারী ৭। মুসলিম ৮। মিশকাত, ৯। আবু দাউদ, ১০। ইবনু মাজাহ ১১। সুন্নাত ও বিদআত - মাওঃ আঃ রহীম। ১২। তাওহীদ বা একত্ববাদ -শাইখ আহমদ আব্দুল লতীফ, ১৩। পীরতন্ত্রের আজবলীলা- বর্ধমানী, ১৪। ইসলাম ও পীরতন্ত্র- ইঞ্জিঃ শামসুদ্দীন আহমেদ. ১৫। ফকীর ও মাজার থেকে সাবধান- হাঃ মাওঃ হোসেন, ১৬। দ্বীনুল হক- কাজি আঃ মাতিন। পাকা মাযার ও বিভিন্ন পাপাচার-আইনুল বারী, ১৭। আল ফিরকাতুন নাজিয়াহ- জামিল যাইনু ১৮। ফাতওয়া ও মাসায়েল- আব্দুল্লাহিল কাফী, ১৯। পীরতন্ত্র বাদ গুরুবাদ ঐ, ২০। ইসলামী বিশ্বকোষ- ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ২১। ধর্মের নামে একি উপদ্রব- প্রফেসর এ. এইচ. এম শামসুর রহমান, ২২। যে সব কুসংস্কার ও বদভাস অবশ্যই ছাড়তে হবে- আহ্‌লে হাদীস দর্পণ, ২৩। ইসলামী দিক নির্দেশনা- জামিল যাইনু ২৪। আরকানুল ইসলাম ওয়াল ঈমান ও আল- আক্বীদাহ আল- ইসলামিয়াহ্‌- ঐ, ২৫। হৃদয়ে রক্তক্ষরণ ও নয়নে অশ্রুপাত- সংকলেনঃ কুরআন হাদীস রিসার্চ সেন্টার, ২৬। বিদআত- মুনৌওয়ার বিন আঃ আযিয, ২৭। ইসলাম ও তাসাউফ- আলীমুদ্দীন নদীয়াভী, ২৮। তাওহীদ বনাম শির্ক- অধ্যাপক আব্দুল নূর সালাফী, ২৯। আল্লাহ পাকের দাসত্ব- মূলঃ ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রঃ) ৩০। ফিরকাবন্দীর মুল উৎস- আবু মুঃ আলীমুদ্দীন, ৩১। তর্জুমানুল হাদীস, ৩২। সুন্নাত বনাম বিদআত- অধ্যাপক মাওঃ আব্দুর নূর সালাফী ৩৩। অসীলাহর মর্ম ও বিধান- ডঃ সালিহ বিন সা'দ আসসুহাইনী, ৩৪। আহ্‌লে হাদীস দর্পন- (পত্রিকা), ৩৫। সাপ্তাহিক আরাফাত, ৩৬। তিরমিযী, ৩৭। নূরুল ঈমান- মাওঃ আব্বাস আলী, ৩৮। রসূলুল্লাহর (সঃ) সালাত- আবু মুহাম্মাদ আলীমুদ্দীন নদীয়াভী, ৩৯। ফরহঙ্গে রাব্বানী (উর্দু বাংলা অভিধান), ৪০। তরীকায়ে মুহাম্মাদী- মাও মতিউর রহমান সালাফী, ৪১। তাওহীদ ও শির্ক- মাও আঃ রহীম, ৪২। উসুলুল ঈমান- শায়খ মুহাম্মাদ বিন সুলাইমান আল-তামীমী (রঃ), ৪৩। ঈমান ও আক্বীদা- শায়খ মুহাম্মাদ বিন সুলাইমান আল- তামীমী (রঃ), ৪৪। তাওহীদের মর্মকথা, ৪৫। ঈমান ও আক্বীদা- শাঈখ আইনুল বারী আলীয়াভী, ৪৬। রাহে আমল-আল্লামা জলীল আহসান নদভী, ৪৭। ইন্তেখাবে হাদীস, ৪৮। আল্লাহ্ পাকের দাসত্ব। ৪৯। শাফায়াত ও অসীলা- আবুল কালাম ফখরুল ইসলাম, ৫০। তাওহীদের মর্মকথা মূলঃ শাইখ আব্দুর রহমান বিন নাসের আস্ সা'দী, ৫১। বিশ্ব যখন এগিয়ে চলছে- মুহাম্মাদ জিল্লুর রহমান বিন নাসের আস্ সা'দী, ৫২। মাসিক রহমানী পয়গাম।